গান্ধীজীকে জানতে হলে

[ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলসমূহের জন্ম প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত]

শ্রীহরপদ চট্টোপাধ্যায়

চব্বিশপরগনা জেলা ছাত্র-কংগ্রেসের সভাপতি,
বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী শ্রমিককর্মী

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড্
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ
৭৮৷৬, লায়েল ষ্ট্রীট্, ঢাকা

দ্বিতীয় প্রকাশ
১৩৫৬

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

বাংলার গণনায়ক ও শ্রমিকনেতা

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়

পরমশ্রদ্ধাভাজনেষু

বিপিনদা,

পরাধীনতার নাগপাশ কাটাবার জন্যে অধীর হ'য়ে যৌবনে সুরু করেছিলেন রুধিরাক্ত বিপ্লবী আন্দোলন। যৌবন আর প্রৌঢ়কাল কেটে গেলো সাম্রাজ্যবাদীর কারাগারের অন্ধগুহায়। রক্ত-বিপ্লবের চূড়ান্ত ক'রে অবশেষে দেখলেন, অধীর রক্ত-বিপ্লবে জনগণের প্রকৃত মুক্তি আসে না—আসে স্থির আদর্শকেন্দ্রিক গঠনকার্যের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মার আদর্শবাদই আপনার ভেতর আনলো এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন—শ্রেষ্ঠ একজন বিপ্লবীকে ক'রে তুললো শ্রেষ্ঠ এক গঠনকর্মী।

মহাত্মার নীতি আর আদর্শ যাতে সুষ্ঠু বনিয়াদ লাভ করে, সে আশায় তাঁর মতবাদ আর জীবনকথা নিয়ে এই বই লিখলাম। মহাত্মার আদর্শের সাফল্যের এক জ্বলন্ত উদাহরণ আপনি স্বয়ং। জীবন-আদর্শের অপূর্ব দর্শন, যা বর্তমান পৃথিবীতে গান্ধীজীর সর্বশ্রেষ্ঠ দান, সেটাকেই বরণ ক'রে নিয়েছেন আপনার আদর্শ ব'লে। আপনাকেই উৎসর্গ করলাম আমার এই বই—পৃথিবীর মহত্তম মানবকে চিত্রিত করবার ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টার এই নিদর্শন।

আগরপাড়া নর্থ্ স্টেশন রোড
পোঃ কামারহাটি, চব্বিশপরগনা
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪

স্নেহধন্য
হরপদ

নিবেদন

ছাত্ররাই ভবিষ্যৎ-দেশের নাগরিক, স্বরাজের বনিয়াদ গড়বে তারাই। স্বরাজসাধনার প্রতিটি ধাপের সঙ্গে তাই তাদের পরিচয় থাকা দরকার। ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত মহাত্মাজীর নীতি হচ্ছে সমাজনীতি, সমাজের পরিবর্তন আর সুসংগঠনের জন্যে এই নীতি আর আদর্শ সম্বন্ধে দেশবাসীর জ্ঞান থাকা উচিত একান্তভাবে। এই প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রে সহজবোধ্য একখানি গান্ধীপরিচিতি রচনা করবার জন্যে আমাকে উৎসাহিত করেন অগ্রজ সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়। রচনা শেষ ক'রে বইএর যথাযোগ্যতা বিচার করতে দিলে, তিনি বললেন, সে-বিচার করবে এর কিশোর পাঠকরা। সুতরাং আমি কিশোরমনের বিচারশালায় রায়প্রার্থীর কাঠগড়ায় অপেক্ষা ক'রে রইলাম।

বিশেষ ক'রে ছোটদের জন্যে সহজ ক'বে লিখবার প্রচেষ্টায় এ বইতে জটিলতার অবতারণায় যথাসাধ্য বিরত রয়েছি। জটিল জিনিসকে সহজতম করার দুঃসাধ্যসাধনের ফাঁকে এতে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাওয়াই সম্ভব। সুধিবৃন্দের কাছ থেকে সে-সবের নির্দেশ আর ক্ষালনের উপদেশ পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।

—গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নিবেদন

বাংলাদেশের সহৃদয় ব্যক্তিদের সহানুভূতি পেয়ে এই বইএর প্রথম সংস্করণ মাত্র এক বৎসরেই নিঃশেষিত হয়েছে। মার্জিত হ'য়ে প্রকাশিত হোলো এর দ্বিতীয় সংস্করণ। সমাজ-সেবী হিসেবে আমার অত্যধিক কর্মব্যস্ততার দরুণ বইখানির পরিমার্জনেব সময় পাইনি বলেই এই সংস্করণ প্রকাশে একটু বিলম্ব হোলো। বিলম্বেব জন্য দোষী আমি নিজে—তাই মার্জনা চাইছি সমাজের কাছে।

বইখানি সংবাদপত্রগুলির এবং জনতার কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে—এজন্যে আমি কৃতার্থ। আমার বিশ্বাস, উপহারেব জন্য ছাড়াও যদি এই বইখানি বিদ্যালয়গুলির উচ্চতর শ্রেণীতে, বিশেষত সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে দ্রুত-পঠনের জন্য নির্বাচিত হয়, তাহলে ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির কিছু সহায়তা হবে। এজন্যে সহৃদয় শিক্ষক মহাশয়দের সহানুভূতি প্রার্থনা করছি।

আগরপাড়া	বিনীত
৩রা জুলাই, ১৯৪৯	**লেখক**

গোড়ার কথা

বিজ্ঞান যা শেখালো তাতে অবাক হ'য়ে যাই, চোখে ধাঁধা লাগে।

সূর্য থেকে জন্ম নিয়েছিলো পৃথিবী—হু'শো কোটি বৎসর কি তারও আগে। তখনকার পৃথিবী ছিলো জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। লাখো লাখো বছর ধ'রে আকাশে থেকে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে ক্রমে ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো পৃথিবী। মানুষের কোনো চিহ্ন ছিলো না তাতে। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর বুকে নাকি প্রথমে জন্ম হয়েছিলো জ্যান্ত শেওলার। ক্রমে তা থেকে জন্মালো ব্যাঙাচির মতো ছোটো ছোটো পোকা—এখনকার মানুষ নাকি তার থেকেই এসেছে। বিজ্ঞানী ডারউইন বললেন, 'বাঁদরের মতো জীব থেকে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের।'

সৃষ্টির সেই প্রথম যুগে মানুষ থাকতো বনে-জঙ্গলে। আগুন জ্বালতে জানতো না—ক্ষিধে পেলে পশু মেরে তার মাংস খেতো কাঁচা কাঁচা। ক্রমে সে আগুন জ্বালতে শিখলো, লজ্জা ঢাকবার জন্যে পরলো গাছের ছাল। দল বেঁধে থাকতে সুরু করলো জায়গায় জায়গায়। যে দলের জোর যত বেশী, সে-দলই কর্তৃত্ব করতে লাগলো অপর দলের উপর।

তারপর হাজার হাজার বছর গেছে কেটে। ভিন্ন ভিন্ন দলের মানুষ তখন পৃথিবীর নানা জায়গায় বাস করছে। নিজেদের দরকারের জন্যে তারা আবিষ্কার করলো নানা জিনিস। সমাজ বেঁধে মানুষ বাস করতে শিখলো ক্রমশ। তখনও চলছে সমাজে সমাজে, দেশে দেশে যুদ্ধ—একে চাইছে অপরকে দাবিয়ে নিজের অধীনে নিয়ে আসতে।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর

আর পূবে শ্যামদেশ—এর মাঝে গ'ড়ে উঠলো ভারতবর্ষ—আড়াই হাজার মাইল লম্বা আর দু'হাজার মাইল চওড়া। অফুরন্ত তার খাদ্য আর সম্পদ—তাই লুট করবার জন্যে কত বিদেশী এলো এদেশ অধিকার করতে। কেউ পারলো, কেউ পারলো না।

দু'হাজার বছর আগের ইতিহাসে জানতে পারা যায়, হিন্দুরা ছিলো এদেশের শাসক। তারও হাজার বছর পরে দেশ অধিকার করলো মুসলমানশক্তি। রাজা অনেক সময় খামখেয়ালে কাজ করতো, কিন্তু খাওয়া-পরার অভাব কা'কে বলে, লোকে জানতো না।

মানুষের সুবিধার জন্যে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে লাগলো যন্ত্রের। ক্রমে সেই যন্ত্রই পৃথিবীর বুকে এনে দিলো অশান্তি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ। এক দেশ চাইলো অপর দেশ অধিকার ক'রে তার উপর প্রভুত্ব করতে, অত্যাচার করতে,—যেমন চাইতো আগের 'অসভ্য' মানুষ। আজ তাই প্রশ্ন করি নিজেকে, আগের মানুষও লোকের উপর অত্যাচার করতো, একে চাইতো অপরের উপর কর্তৃত্ব, এখনকার মানুষও তো তাই করে। আগের মানুষকে বলি 'অসভ্য', কিন্তু আজকের মানুষকে 'সভ্য' বলবো কি ক'রে ?

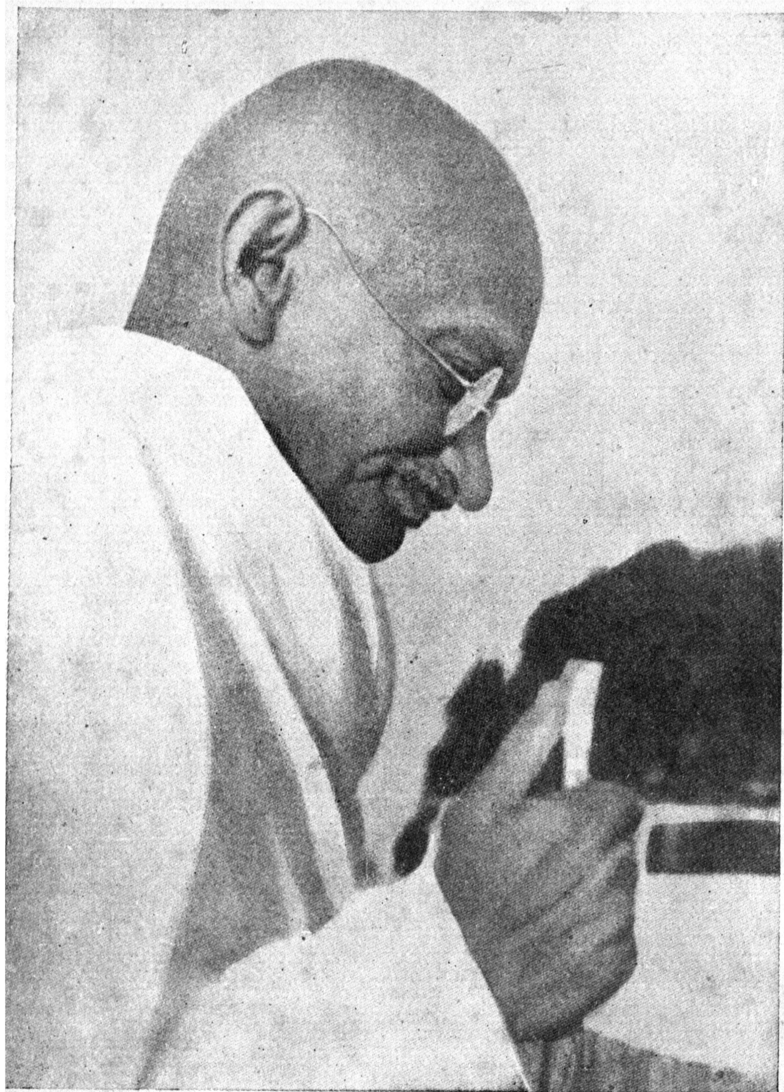
তোমরা নিশ্চয়ই জানো, কত বড়ো একটা যুদ্ধ হ'য়ে গেলো দুনিয়ার বুকের উপর। নিশ্চয়ই জানো, কত লোক না খেয়ে মরেছে আমাদের দেশে, খিদের জ্বালায় গাছের পাতা আর অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে কত লোক! একশো হাজারে যে এক লাখ হয়, তারই পঞ্চাশ লাখেরও বেশী লোক না খেয়ে মারা গেছে শুধু এই বাংলাদেশে। কেবল খাবার নয়, যে সব জিনিস রোজ আমাদের দরকারে লাগে, তারও প্রত্যেকটি আমাদের পেতে কত কষ্ট হয়েছে। পেলেও তা পেয়েছি আগুনের দামে। এক দিস্তা কাগজ, যুদ্ধের আগে যার দাম

ছিলো পাঁচ পয়সা, সেই কাগজের এক দিস্তা তোমরা দশ-বারো আনা দিয়েও কিনেছো। এইরকম সব জিনিসের বেলাই। বোমার ভয়ে তোমরা কতজন কত দিকে পালিয়েছো, কত জনের পড়াশুনো নষ্ট হয়েছে। শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর যে যে দেশ এই সর্বনাশা যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়েছিলো, সব দেশেই একই ব্যাপার হয়েছে।

যুদ্ধ যখনই শেষ হ'য়ে যায়, সব দেশই বলে আর যুদ্ধ করবো না, এবার বেশ মিলে মিশে শান্তিতে থাকবো। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ আবার বাধে, আবার কামানের মুখে, বোমার আঘাতে, বন্দুকের গুলিতে লাখো লাখো লোক মারা যায়, না খেয়ে মারা যেতে থাকে লাখো লাখো গরিব লোক।

যুদ্ধের আর অনাহারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পৃথিবীর অনেক পণ্ডিত লোক মানুষকে নানা রকম পথে চলবার জন্যে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন—এই পথে চলো, যুদ্ধ আর হবে না, তোমরা ভালোভাবে থাকবে। কিন্তু যুদ্ধের আর শেষ হোলো না। এইভাবে অনবরত যদি যুদ্ধই চলে, মানুষ সুখে-শান্তিতে থাকবে কি ক'রে ?

তাই গরিবের আর মানুষের বন্ধু গান্ধীজী মানুষকে দেখালেন এমন এক পথ, যে পথে গেলে দুনিয়ায় যুদ্ধ আর হবে না, খাবার পাবার জন্যে বড়লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে মরতে হবে না মানুষকে,—মানুষ সুখে-শান্তিতে বাঁচতে পারবে।



মহাত্মা গান্ধী

হিংসা, অহিংসা ও শান্তি

ননী আর পিণ্টুতে কি একটা কারণে ঝগড়া বেধে গেলো। ঝগড়া আর মুখে রইলো না, একেবারে হাতাহাতি সুরু হয়ে গেলো। ননীর গায়ের জোর পিণ্টুর চেয়ে বেশী। তাই ননী কষে এক ল্যাং মারতে পিণ্টু মাটিতে প'ড়ে গেলো। পিণ্টু মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালো, গায়ের জোরে এক ঘুষি মারলো ননীকে, মেরেই ছুটলো বাড়ির দিকে। তাতেও কি নিস্তার আছে! পিণ্টুব বাড়িতে ঢুকেই ননী মারতে সুরু ক'রে দিলো তাকে।

ঝগড়া দিনের পর দিন বেড়েই চললো। কয়েকদিন পরে ননী ছুটো ছেলে নিয়ে রাস্তার পাশে ঘুপটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলো, পিণ্টু সে পথে যেতেই ধ'রে লাগালো বেদম প্রহার। পিণ্টুও জোগাড় করলো গোটা তিনেক ছেলে, ধ'রে ননীকে মার খাওয়ালে আর একদিন! এভাবে ছু'দলেই ছেলে ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো। ননী ছেলে জোগাড় করলো লজেন্স ঘুষ দিয়ে আর পিণ্টু জোগাড় করলো বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে।

একদিন বিকালে তুই দলে দারুণ মারামারি হোলো; তাতে ছু'দলেরই ছেলে জখম হোলো। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ঘুরতে

লাগলো ছ'দলেরই ছেলেবা। তবু তাদের ঝগড়া তো থামা দূরে থাক, বেড়েই চললো।

অবশেষে ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন পাড়ার বিশুদা। তিনি ননী আর পিণ্টু ছ'জনাকেই ডেকে বললেন, 'দেখলে তো, মারামারি সুরু করলে থামতে চায় না। মারামারি যদি থামেও একদিন, রাগ থামবে না। এই রাগ থেকেই আবাব ঝগড়া সুরু হবে, তা থেকে সুরু হবে মারামারি। অথচ তোমাদের এই ঝগড়ার কাবণ অতি সামান্য। ছ'জনে মিটিয়ে নিলেই পারতে। এভাবে মারামাবিই যদি করে চলো, কাজ করবে কখন ? দেখো দেখি, কতো সময় তোমরা নষ্ট করেছো মারামারিতে আর মারামারিব চিন্তায়! পথের ছুটো কুকুব ঝগড়া করতে পাবে—তোমরাও তাদেবই মতো যদি ঝগড়া করো, তোমরা তাদের চেয়ে বড় হ'লে কিসে ?'

ননী আর পিণ্টু দেখলো, বিশুদা ঠিকই বলেছেন। তাবা বিশুদাকে বললো, 'আমরা আর কখনও ঝগড়া করবো না, বিশুদা!'

পিণ্টু আর ননীতে ভাব হ'য়ে গেলো। একজন যদি কোনো সময় অন্যায় করে, আব একজন তাকে বুঝিয়ে দেয়। ঝগড়া আর তাদের কোনদিন হোলো না।

এইরকম, ননী আর পিণ্টুর মতো ঝগড়া করে ছুনিয়ার

প্রায় সব লোক। একজন একজনের সঙ্গে, পাঁচজন পাঁচজনের সঙ্গে, একটা দল আর একটা দলের সঙ্গে, একটা জাতি আর একটা জাতির সঙ্গে, একটা রাজ্য আব একটা রাজ্যেব সঙ্গে। ঝগড়া থেকে সুরু হয় তাদেব হাতাহাতি। ছোটখাটো হাতাহাতিকে বলি মাবামারি, আব অস্ত্র নিয়ে, কামান নিয়ে, বন্দুক নিয়ে যে মারামারি হয়, তাকেই বলা হয় যুদ্ধ।

হাজাব হাজার বছর ধ'রে মানুষ মানুষকে হিংসা ক'বে এসেছে, এই হিংসা মানুষ তার মন থেকে দূব কবতে পারে নি, তাই মানুষ যুদ্ধ করেছে। বিখ্যাত সুলতান মামুদ আর দস্যু চেঙ্গিস্ খাঁ, মহম্মদ ঘোরী আর নাদির শাহ্ আমাদের দেশে লুটপাট করতে এসেছিলো। হাজার হাজার নিরপরাধ লোককে মেরে তারা নিজেদের ভেবেছিলো জয়ী, কিন্তু জয় তারা করতে পারে নি। তাদেব চেয়েও শক্তিশালী দল এসে তাদেব কাছ থেকে বাজ্য কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে তাদের ধন-সম্পত্তি। আমাদের দেশের কথাই ভাবো না। প্রথমে রাজা ছিলো হিন্দুরা, তার পরে হিন্দুদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নিলো মুসলমান,—তারাই হোলো রাজা। মুসলমানদের হাত থেকেও রাজ্য কেড়ে নিলো ইংরাজরা, বললে, 'আমরা হ'লাম জয়ী, আমরাই হবো দেশের রাজা।'

এইবার গোটা দুনিয়াটার দিকে তাকাও। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাপানীরা রাশিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিলো যুদ্ধে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সেই জাপান রাশিয়ার কাছে হেরে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী হেরেছিলো ফরাসীদের কাছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফরাসীরা আবার হেরেছে জার্মানীর কাছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া হেরেছিলো জার্মানীর কাছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী হেরে গেছে রাশিয়ার কাছে। এইরকম আরো কতো! প্রত্যেকবার যে জাতি জিতেছে, তারাই বলেছে, 'আমরা বড়ো ক্লান্ত, আর যুদ্ধ ক'রে দরকার নেই, এইবার এসো আমরা সবাই মিলে ঠিক করি—কিসে শান্তি আসবে; যুদ্ধে যাবা হেরে গেছে, কি করলে তারা আবার শক্তিশালী হ'য়ে উঠবে না, মানুষ শান্তিতে থাকবে।' কিন্তু আসলে তারা ঠিক করে নিজেদেব লাভের ভাগ, ঠিক করে যুদ্ধে হেরে-যাওয়া জাতিগুলোকে জব্দ করার ব্যবস্থা। কিন্তু হেরে-যাওয়া জাতিগুলো আবার শোধ নেবার জন্যে তৈবী হয়ে ওঠে, আবার যুদ্ধ লাগে। হাজার হাজাব বছর ধ'রে পৃথিবীতে এই-ই চ'লে আসছে।

তাই মহাত্মা গান্ধী বললেন, 'এ পথে শান্তি আসবে না, আসতে পারে না। যতদিন মানুষ মানুষকে হিংসা করবে, ততদিন ঝগড়া হবে, যুদ্ধ হবে, দুনিয়ায় শান্তি কিছুতেই আসবে না। সুতরাং অহিংসাই হচ্ছে শান্তির প্রকৃত রাস্তা।'

'হিংসা' থাকবে না, এরই নাম 'অহিংসা'—নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। গান্ধীজী বললেন, 'লোককে যদি ভালো করতে হয়, তবে তাকে মেরে ভালো করা যায় না, তাকে ভালবাসতে হয়, ভালো কথায় তার ভুল বুঝিয়ে দিতে হয়।' মনে করো,

কোনো লোক তোমার ওপর অত্যাচার করলো। শোধ যদি নিতে চাও, তাকে অবশ্য মারতে পারো, কিন্তু ভুলে যেয়ো না,—সেও তোমার ওপর শোধ নেবার চেষ্টা করবে একদিন-না-একদিন। আর যদি তাকে ভালো করতে চাও, অন্যায়ের পথ থেকে ফেরাতে চাও, তবে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করো। তাকে তার ভুল বুঝিয়ে দাও, তাকে ভালোবাসো, দেখবে, সেও ভালো হ'য়ে যাবে। তোমার সঙ্গে শত্রুতা সে কখনও করবে না। এইরকম ভাবে দুনিয়ার সব লোক যদি সব লোকের প্রতি অহিংস থেকে অপরের দোষ সারাবার চেষ্টা করে, আর ভালোবাসতে শেখে সব লোককে, হিংসা যদি কেউ কাউকে না করে, দুনিয়ার মধ্যে কোনো অশান্তি আর তা হ'লে থাকবে না। গান্ধীজী এই কথাটাই বুঝিয়ে আসছেন আজ পঞ্চাশ বছর ধ'রে; কেউ তাঁর কথা শোনে, কেউ শোনে না।

অহিংসার কতকগুলো উদাহরণ দেবো। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান বন্দরে ভুল বুঝে কতকগুলো গোরা গান্ধীজীকে মেরেছিলো। গান্ধীজী তাদের বিরুদ্ধে কিছু বললেন না। ডেকে তাদের ভুল বুঝিয়ে দিলেন। তারপর থেকে তারাই গান্ধীজীর বিশেষ বন্ধু হ'য়ে উঠলো। আর একবার গান্ধীজীকে দুই পাঠান খুব মেরেছিলো। গান্ধীজী তাদেরও ডেকে মিষ্টি কথায় তাদের ভুলগুলো বুঝিয়ে দিলেন। তারা শেষে গান্ধীজীর খুব ভক্ত হ'য়ে উঠলো। এরকম উদাহরণ গান্ধীজীর

জীবনে অসংখ্য, অজস্র। চৈতন্যদেবের কথা ভাবো। জগাই-মাধাইকে তিনি খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন মারধোর দিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে। লোকে খারাপ কাজ, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচাব করে কেন?—তাদের মনে নিশ্চয়ই বয়েছে দোষ, রয়েছে হিংসা। মন থেকে হিংসা দূর হলেই মানুষ অন্যায় আব করবে না। আব, হিংসাকে দূর কববার জন্যে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র।

অহিংসাব মানে যে শুধু হিংসা না ক'বে ব'সে থাকা, তা নয়। কাউকে হিংসা না ক'বে তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসা —এই হোলো অহিংসাব আবো একটা উদ্দেশ্য। ধরো, একজন লোক তোমাব প্রতি অন্যায় কবলো। তুমি তাকে কিছু বললে না, তাকে মারলে না, ধরলে না, চুপচাপ ব'সে থেকে বললে, 'এই তো তাকে আমি হিংসা কবছি না, সুতরাং আমি অহিংস!' কিন্তু অহিংসাব সবটুকু করা হোলো না। যতক্ষণ না তুমি তাকে তাব অন্যায় ভালো কথায় বুঝিয়ে দিয়ে তাকে ঠিক পথে আনতে পাবলে, ততক্ষণ তোমাব অহিংসা সফল হোলো না।

ঘৃণা থেকেই মনে হিংসার ভাব আসে। তাই অহিংসাব উদ্দেশ্য হচ্ছে পবকে ভালোবেসে তার মনের ঘৃণা দূব করতে হবে, পবের ভালো ক'বে তাব মন থেকে মন্দ দূর কবতে হবে। এ সম্বন্ধে গান্ধীজীর একটা কথা মনে রেখো,— 'ভালোবাসাব আগুনে সব চেয়ে শক্ত জিনিসও গলে যায়।

যদি না গলে, বুঝতে হবে সে ভালোবাসার আগুনের জোর কম।' তিনি বলতে চান যে, যত কঠিনই কারও প্রাণ হোক না কেন, যদি মন ঢেলে দিয়ে তাকে ভালোবাসা যায়, তবে সে নিশ্চয়ই ভালো হ'য়ে উঠবে; যদি না হয়, বুঝতে হবে, তুমি তাকে ভালোবাসতে পারো নি।

আমাদের ভাবতবর্ষেব ওপব ইংরেজরা অনেক অন্যায়, অবিচাব, অত্যাচার করেছে। গান্ধীজী অন্যায় দেখলেই তাব প্রতিবাদ কবেছেন, সেরকম অন্যায় না-করার জন্যে ইংরেজকে ভালো কথায় অনেক বুঝিয়েছেন। যেখানে ইংরেজ তাঁর কথা শোনে নি, সেখানে দল বেঁধে তিনি আন্দোলন চালিয়েছেন—অন্যায়ের প্রতিবাদে। মারামাবি কোথাও তিনি করেন নি। প্রত্যেক জায়গায়ই তিনি জয়ী হয়েছেন। ভেবে দেখো, অহিংসা দিয়ে কতো বড়ো বড়ো কাজ কবা যায়।

অহিংসার আব একটা বড়ো কথা হচ্ছে—শৃঙ্খলা পালন করা, নিয়ম মেনে চলা। তুমি যেটাকে সত্য ব'লে, ন্যায় ব'লে বুঝলে, সেইটার কথা মুখে নিয়ে অন্যায়েব প্রতিবাদ করবে জোর গলায়, বুকে সাহস রেখে। সকলকে তোমার কথা বোঝাবে, তোমার দলে আনবে তাদের। সকলের এই দাবীকে উড়িয়ে দেবার শক্তি পৃথিবীর কারও নেই। কিন্তু মনে রেখো শৃঙ্খলা বজায় রাখাব কথা। একজন যা বলবে, সকলে যেন তাই বলে, একজন যা কববে, সকলে যেন তাই করে।

অহিংসা হচ্ছে সত্যকে ফুটিয়ে তোলার পথ। একটা সত্যি কথা বলতে কি তুমি ভয় পাবে ?—নিশ্চয়ই পাবে না। সুতরাং অহিংস উপায়ে যে-কোনো সত্যকে প্রচার করতে বা যে-কোনো অন্যায়েয় প্রতিবাদ করতেও তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাবে না। এই অহিংস উপায়েই শত শত অন্যায়ের প্রতিবাদ ক'রে গান্ধীজী সফল হয়েছেন—প্রায় কোথায়ও তিনি বিফল হন নি। এই অহিংস উপায়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন ক'রে গোটা দুনিয়াটাতে তিনি সাড়া জাগিয়েছেন, অন্য কোনো অস্ত্র নেই তাঁব হাতে—একমাত্র অহিংসার অস্ত্র ছাড়া।

গান্ধীজী বলেন, 'যে-কোনো অন্যায়ের, অসত্যের, অবিচারের মূলেই রয়েছে হিংসা।' কারখানার মালিকের টাকা ব্যাংকে দিনের পর দিন রাশীকৃত হ'য়ে উঠছে, আর সেই কারখানার মজুর আধপেটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে,—সে ক্ষেত্রে মালিকই মজুবদের হিংসা করছে। যে জমিদারের অধীনে চাষীবা না খেয়ে মবে, জমিদার সেখানে চাষীকে করছে হিংসা। লক্ষ্য কোরো—গান্ধীজীর মতে হিংসার অর্থ রয়েছে কতখানি জুড়ে!

'অহিংসা'—এই কথাটা গান্ধীজীর সমস্ত কথাকে জুড়ে আছে। সত্যাগ্রহ, যন্ত্র, টাকা, ক্ষমতা, গড়ার কাজ, পঞ্চায়েত, স্বাধীন ভারত সম্বন্ধে পরিকল্পনা, সবগুলোর সম্বন্ধে তাঁর প্রথম এবং শেষ কথা 'অহিংসা'। এমন কাজ তিনি

কোথাও কখনও করতে বলেন নি, যা থেকে উৎপত্তি হতে পারে হিংসাব। স্বাধীন ভারত সম্বন্ধেও এমন পরিকল্পনা তিনি করেছেন, যাতে লোকে হিংসা ভুলে যাবে। পৃথিবীর সব দেশ যদি তাঁর কথা অনুসাবে চলে, যুদ্ধ আর কোনো দিন হবে না কোথাও।

কিছুদিন আগে বৃটিশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন চার্চ্চিল সাহেব। তিনি গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'যদি ভারতে বৃটিশ-রাজত্ব রক্ষা করতে চাও, তবে ঐ অর্ধ-উলঙ্গ ফকিরটাকে আন্দামানে দ্বীপান্তর দাও।' ভেবে দেখো, অহিংসার যদি বিরাট শক্তিই না থাকবে, তবে ইংবেজের মতো এতবড় একটা শক্তিও তাকে ভয় করে কেন?

সত্যাগ্রহ

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হোলো ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে। ত্রিবাঙ্কুরের মধ্যে ভাইকম ব'লে একটা জায়গা আছে। সেখানকার যেটা রাজপথ অর্থাৎ বড় রাস্তা, সে রাস্তা দিয়ে সকলে যেতে পারতো না। 'বড় জাতের' হিন্দুরা যাদের ছোঁয় না, সেইসব 'ছোট জাতের' লোকেরা ভাইকমের রাস্তা দিয়ে চলতে পারতো না।

গান্ধীজী দেখলেন, এ বড়ো অন্যায়। যারা 'ছোট জাত' তারাও তো মানুষ—অন্য মানুষের মতো রক্ত-মাংস দিয়ে তারাও তো গড়া। বড় জাতকেও সৃষ্টি করেছেন ভগবান, ছোট জাতকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। অতএব অন্য মানুষ যে-রাস্তা দিয়ে যেতে পারে, 'ছোট-জাতেরা' সেখান দিয়ে যেতে পারবে না কেন?—এই সত্য তাঁর মনে জেগে উঠলো।

বড় জাতের হিন্দুরা যাদের ছুঁতেও ঘৃণা বোধ করে, সেই সব অস্পৃশ্যদের গান্ধীজী বলেন 'হরিজন' অর্থাৎ ভগবানের লোক। কংগ্রেসের কয়েকজন লোকের সঙ্গে হরিজনদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন সেই রাস্তায়। ব'লে দিলেন, 'যতক্ষণ না রাস্তা দিয়ে যেতে দেবে, ততক্ষণ সেখানে ব'সে থাকবে!'

শত শত হরিজন গিয়ে দাঁড়িয়ে বইলো সেই রাস্তায়। পুলিস তাদের যেতে দিলো না। মুষলধারে বৃষ্টি হ'য়ে রাস্তায় হাঁটুজল হ'য়ে গেলো। হরিজনদের মুখে এক কথা, 'আমাদেব এই রাস্তা দিয়ে যেতে দিতে হবে।' পুলিস তাদেব ধমকালো, লাঠিপেটা কবলো, নানাবকম অত্যাচাব কবলো তাদেব ওপর ; কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে বইলো অচল-অটলভাবে। এতজনের দাবী পুলিস উড়িয়ে দিতে পাবলো না। অবশেষে বাস্তা খুলে দিতে তারা বাধ্য হোলো। যে সত্য গান্ধীজীব মনে জেগে উঠেছিল, সেই সত্যই শেষে জয়ী হোলো।

হাতে কোন অস্ত্র নেই, মুখে কোন অন্যায় কথা নেই, মনে বিন্দুমাত্র হিংসাব ভাব নেই, সহজ এবং সবল ভাবে সত্যেব জন্য আগ্রহ দেখিয়ে, মুখে সেই সত্য প্রচাব ক'বে, সত্যকে জয়ী ক'রে তোলার জন্য যে আন্দোলন, তাকেই বলা যায় 'সত্যাগ্রহ'। ভাইকমের বাস্তায় হবিজনদেব আন্দোলন সত্যাগ্রহের একটি সুন্দব উদাহবণ।

সত্যাগ্রহের জন্য সবচেয়ে বেশী দবকার যেটার, সেটা হচ্ছে অহিংসা। সত্যের মধ্যে হিংসার কোনো স্থান থাকতে পাবে না। যেটা আমি সত্য ব'লে বুঝলাম, সেটা আমি সরলভাবে প্রচার করবো ; যদি কোনো অধিকার আমাব পাবার থাকে, সে অধিকার দাবী করবো জোব গলায়। কেউ বাধা দিলে তাকে বুঝিয়ে বলবো। যতক্ষণ না আমাব দাবী পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চালিয়ে যাবো। যত লোককে পাবি

আমার দলে আনবো। এত লোক মিলে যে দাবী করবো, তাকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা কারও নেই।

সত্যাগ্রহের আব একটা বড় কথা হচ্ছে শৃঙ্খলা বা নিয়ম মেনে চলা। খানিকক্ষণ সত্যাগ্রহ ক'বে 'তুত্তোর' ব'লে চ'লে আসা সত্যাগ্রহীব পক্ষে অধর্ম। যেসব সৈন্য যুদ্ধ করতে যায়, তারা যেমন কোনো-কিছুকেই ভয় করে না, সেইরকম সত্যাগ্রহ যারা কববে, তাবাও যেন কোনো কিছু এমন কি মবণের কাছে পর্যন্ত হাব না মানে, সেটা দেখতে হবে। সত্যের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পাবার মতো লোকই সত্যাগ্রহ করতে পারে! এইরকম ভয়শূন্য—নির্ভীক লোক নিয়ে গান্ধীজী যেখানেই সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চালিয়েছেন, সেখানেই তিনি জয়ী হয়েছেন। দু'একটা জায়গায়, যেখানে লোকে সত্যাগ্রহ এবং অহিংসার নিয়ম-কানুন মেনে চলে নি, সেখানে আন্দোলন বিফল হয়েছে। অহিংস সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চালাতে গেলে, কি কি ভাবে কাজ করা হবে, কি ভাবে আন্দোলন চালাতে হবে, তা আগে থেকে ঠিক ক'রে নিতে হবে। একবার সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলে মতের যেন পরিবর্তন না হয়, সকলকে এক কথা মুখে নিয়ে একভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে।

সত্যাগ্রহীর আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। মনের বিশ্বাস হচ্ছে সত্যাগ্রহের একটা মস্ত বড়ো শক্তি। এই মনের বিশ্বাস বজায় রাখতে হলে, পরের সেবা খুব কম নিতে হবে। পরের সেবা নিলেই আলস্য এসে যায়, আলস্য এলেই

বল ক'মে যায়, আর মনের বল ক'মে গেলে তো সত্যাগ্রহই সফল হবে না। মনে করো, কোনো সত্যাগ্রহী একটা গ্রামে গেছে গ্রামের লোকদের দিয়ে কাজ করাতে। গ্রামের লোকদের বললে, নিজেদের গ্রাম নিজেরাই পরিষ্কার ক'রে নিতে। গ্রামের লোকেরা হয়তো বললে, তাদেব কাছে কোদাল, কুড়ুল বা পরিষ্কার করার অন্যান্য জিনিস বেশী নেই। সত্যাগ্রহী চেষ্টা করবেন যাতে সেই গ্রামের লোকদের দিয়েই সেইসব জিনিস করিয়ে নেওয়া যায়। এতে দুটো উপকার হয়। প্রথম, সত্যাগ্রহীর নিজের কাজ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায় ; দ্বিতীয়, গ্রামের লোকদেরও মনেব উৎসাহ আর বিশ্বাস বেড়ে যায়, তারাও সত্যাগ্রহের জন্য তৈরী হ'য়ে ওঠে ক্রমে।

মনে করো, কোনো ব্যাপাব নিয়ে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। সত্যাগ্রহ যারা করেছে, তাদেব মধ্যে কয়েকজন হয়তো মনের উত্তেজনায় বিরুদ্ধপক্ষের কারও ঘবে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে অথবা কাউকে ধ'রে মারধোব করছে। বুঝিয়ে যদি তাদের পথে আনা যায় তবে তো ভালোই, না হ'লে তখন সত্যাগ্রহ বন্ধ করতে হবে। কারণ, সত্যাগ্রহের মধ্যে তখন হিংসা এসে গেছে, অথচ অহিংসাই সত্যাগ্রহের আসল কথা।

কারও বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ সুরু করবার আগে কয়েকটা কথা ভাবতে হবে। আগে তাকে তোমার দাবী জানাতে

হবে, তাকে তোমাব কথা ভালো কথায় বুঝিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে—তোমরা যা বলছো সেটা 'সত্য', তোমাদেব দাবী সঙ্গত এবং সে-ই অন্যায় কবছে। তার পরেও যদি সে তোমাদের কথা না শোনে, তা হ'লে সত্যাগ্রহ সুরু কবতে হবে। একবাব সত্যাগ্রহ সুরু কবলে সফল না হওয়া পর্যন্ত পেছিয়ে আসা চলবে না। তা হ'লে সত্যাগ্রহের অপমান করা হয়—মনের জোবও ক'মে যায়। যদি তোমাব পথই সত্য হয়, তা হ'লে একা একা সত্যাগ্রহ সুরু করলেও তুমি জয়ী হবে। কাবণ, লাখো লাখো লোক তোমাব পেছনে দাঁড়াবে, তোমার সত্যাগ্রহেব জয় হবে। আর তোমার পথ যদি সত্য না হয়, তোমাব পেছনে কোনো লোক এসে দাঁড়াবে না, তোমাব আন্দোলন বিফল হবে। তখন সেটাকে 'সত্যাগ্রহ' না ব'লে বরং 'মিথ্যাগ্রহ' বলাই ভালো হবে।

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আবো একটা কথা মনে রাখবার আছে। সেটা হচ্ছে, কারও বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ ক'বে জয়ী হ'লে, তাব মনে যদি তোমাব সম্বন্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে, তোমার সত্যাগ্রহ পূর্ণ সফল হোলো না। এব কারণ আছে।—তোমার মনে নিশ্চয়ই কোনো 'সত্য' জেগে উঠেছে, তুমি তারই দাবী নিয়ে সত্যাগ্রহ চালালে এবং জয়ী হ'লে। কিন্তু অহিংস সত্যাগ্রহেব আরো একটা দিক আছে,—যাব বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করলে, তাকে তাব ভুল বুঝিয়ে দেওয়া এবং তোমাব 'সত্য'টা তার মনে ঢুকিয়ে দেওয়া। সে যদি

তার ভুলই বুঝে যায়, সে নিশ্চয়ই তোমার ওপর আর রাগ করবে না, বিদ্বেষসৃষ্টিও হবে না তাব মনে। কিন্তু সত্যাগ্রহে তুমি জয়ী হবাব পবও তোমাব ওপর তার বিদ্বেষ যদি থেকেই গেলো, তা হ'লে বুঝতে হবে, সে তাব ভুল নিশ্চয়ই বোঝে নি, সুতরাং তোমাব সত্যাগ্রহও পুবোপুবি সফল হয় নি।

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে মোটামুটি নিশ্চয়ই বুঝেছো। সত্যাগ্রহেব আব একটা উদাহরণ দিয়েই এ প্রবন্ধ শেষ করবো।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দেব ২১এ নভেম্বারের ঘটনা। আজাদ হিন্দ্ ফৌজেব তিনজন সেনাপতিকে মুক্তি দিবাব দাবী কণ্ঠে নিয়ে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে চলছিলো দল বেঁধে কলকাতাব ধর্মতলা বাস্তাব ওপব দিয়ে। তারা ঠিক করেছিলো—সকলে মিলে ডালহাউসী স্কোয়ার বলে একটা জায়গা ঘুরে আসবে। কিন্তু লাটসাহেবেব আদেশে পুলিস তাদের যেতে বাধা দিলো—বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বললে সবাইকে। কেউ গেলো না, বললে, 'ডালহাউসী স্কোয়ারের রাস্তা দিয়ে যাবাব অধিকার আমাদের আছে। যতক্ষণ না আমাদের যেতে দিচ্ছ, একজনও যাবো না বাড়ী ফিরে।' পুলিস লাঠিপেটা করলো, তারা নড়লো না। পুলিস গুলি চালাতে সুরু করলো, বুক পেতে তারা গুলি খেলো, তবু এক পাও হঠলো না তাদের কেউ। সমস্ত রাত ধ'রে তারা ব'সে রইলো। পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্তও তাবা না খেয়ে দেয়ে রাস্তার ওপর ব'সে রইলো। অবশেষে লাটসাহেব তাদের ডালহাউসী স্কোয়াবে

যাবার আদেশ দিতে বাধ্য হলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এই নিয়ে ইংরেজের ওপব ক্ষেপে উঠলো। লাটসাহেব তাঁর ভুল স্বীকাব করলেন।

ডালহাউসী স্কোয়াব সাধারণেব জায়গা, সেখান দিয়ে যাবাব অধিকাব সকলেব আছে, এইটেই হোলো সেদিনকার ছেলেমেয়েদের মনের সত্য—সত্যাগ্রহ ক'রে এই সত্যকেই তারা জয়ী কবেছে। আগেই বলেছি, একজনও যদি সত্য নিয়ে বুক উঁচিয়ে দাঁড়ায়, দেশের লোকে তাকে সমর্থন করে, তার দলে যোগ দেয়। দেখো, সেদিনকাব ছেলেমেয়েরা একটা সত্যকে সামনে নিয়ে আন্দোলন করেছে, সমস্ত ভারতবর্ষেব লোক তাই তাদেব সমর্থন করেছে। লাটসাহেব তাঁর ভুল স্বীকাব করেছেন। শেষ কথা, এই সত্যাগ্রহ একেবাবেই অহিংস ছিলো। সুতরাং, এই সত্যাগ্রহ সব দিক দিয়ে সফল হয়েছে।

যন্ত্র আর গান্ধীজী

রাস্তার ওদিকে দূবে কয়েকখানা চালাঘর নিয়ে একটা বস্তি। বাদল ওখানকার গনি মিয়াকে খুব ভালো ক'রে চেনে। গনি বেশ ভালো লোক—বাদলকে মাঝে মাঝে বিস্কুট কিনে দেয়।

কালো, লম্বা, হাড়-বেব-কবা চেহারা গনি মিয়ার। বাদল ওর ঘবে ঢুকে দেখেছে, কি রকম ময়লা বিছানায় ও থাকে, কি রকম ময়লা জামা-কাপড় ওর। একদিন বাদল বলেছিলো, 'আচ্ছা, গনি চাচা, তুমি কেন এতো রোগা হ'য়ে যাচ্ছো দিন-দিন, কেনই বা এ রকম ময়লা ছেঁড়া বিছানায় শোও? তোমাব কি পয়সা নেই? ওই কাপড়ের কলে তো তুমি কাজ করো।'

গনিব চোখ ছলছল ক'রে উঠেছিলো। সে বললে, 'বাদলবাবু, পয়সারই অভাব। কলে কাজ ক'রে মাসে তিরিশ টাকা পাই, সেই টাকায় নিজের খেতে আর বউ-ছেলেপুলেকে খাওয়াতেই কষ্ট হয়—বিছানা কেনার আর চেহারা ভালো করবার মতো পয়সা তো আর থাকে না।'

কলেব মালিক 'বড়োসাহেব'কে বাদল দেখেছে; বললে 'আচ্ছা, গনি চাচা, ওই যে মোটর ক'রে তোমাদের

বড়োসাহেব আসে, তাকে বলো না কেন তোমার দুঃখের কথা ?'

গনি বললে 'ওরা কোটি কোটি টাকাব মানুষ, ওবা আমাদের মতো গরিবদের কথায় কান দেবে কেন ?'

আশ্চর্য হ'য়ে বাদল বললে, 'ওদের কোটি কোটি টাকা থাকবে, আব তুমি তোমাব দরকাবের পয়সাটিও পাবে না ? ওরাও মানুষ, তুমিও তো মানুষ, গনি চাচা !'

বাদলেব প্রশ্নই আজকেব পৃথিবীব লোক জিজ্ঞাসা করছে বাব বার—'ওদেব কোটি কোটি টাকা থাকবে, আব গবিবেরা তাদেব দবকাব মতো পয়সাও পাবে না ?'

এর উত্তর দিতে গেলে একটু আগে থেকে বলতে হয়।

কয়েক শত বছব আগেও দেশের প্রায় লোকই গরিব ছিলো না,—সকলে পেট ভ'বে খেতে পেতো। যে-সব কাজ ক'রে তারা খাবাব পয়সা জোগাড় করতো, সে সমস্ত কাজ তাদেব হাতে আর বইলো না, ক্রমে ক্রমে সেই সব কাজ বড়লোকদের হাতে চলে গেলো।

ব্যাপারটা আরো একটু খুলে বলি। মনে করো, কাপড়ের কথা। আগেকার দিনে কাপড়ের মিল ছিলো না, তাঁতীদেব হাতে বোনা কাপড়ই পরতো সবাই—সকলের কাপড় তৈরী করার জন্যে অনেক তাঁতীর দরকার হোতো—অনেক তাঁতী

এইভাবে খাবার পয়সা জোগাড় করতো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলো যন্ত্রের। পাঁচশো লোক হাতে যতটা সুতো কাটতে পারতো, একটা যন্ত্রই তা করতে পারলো। এই একটা যন্ত্র চালাতে হয়তো তিনজন লোকের দরকার, শুধু সেই তিনজন লোকই পয়সা পেলো, আর বাকী লোকগুলো অন্য কাজের চেষ্টায় গেলো। অন্য কাজের অবস্থাও সেই রকম। মনে করো, ধান থেকে চা'ল তৈরী করবার কাজ। হাজার জনে যা চা'ল তৈরী করতে পারে, একটা যন্ত্রই হয় তো সেই কাজ করতে পারলো। চা'ল যারা তৈরী করতো, তাদের হাজার হাজার লোকের পয়সা জোগাড় করার রাস্তা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

একটা লোক, যার কিছু টাকা আছে, সে এই রকম গোটাকয়েক যন্ত্র কিনে নিলো—একটা মিল খুলে বসলো। সমস্ত মিলটা চালাবার জন্যে হয় তো মাত্র পাঁচশো লোকের দরকার, সেই পাঁচশো লোক পনেরো-কুড়ি হাজার লোকের কাজ করতে পারলো যন্ত্রের সাহায্যে। সমস্ত কাজেরই যদি এইরকম অবস্থা হয়, কাজ যারা করতে পারলো না, তারা কি ভাবে পয়সা রোজগার করবে বলো তো? কি ভাবে তারা খাবে?

এই তো গেলো, কাজ যারা হারালো তাদের অবস্থা। ওই সব কলে যারা কাজ করে, তাদের অবস্থা কি রকম এবার দেখো।

যে লোক মিল খুলে বসলো, মিল থেকে তার প্রচুর পয়সা লাভ হয়। একদিকে সে চায় নতুন নতুন কল এনে বেশী জিনিস তৈরী করতে, আর একদিকে চায় কলে যারা কাজ করে, তাদের যত কম মাইনে দিয়ে পারা যায়, তাই দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে। কলে যাবা কাজ করে, সেই সব শ্রমিকেরা খুবই কম মাইনে পায়, তাই গরিব হয়।

তা হ'লে দেখো, নতুন নতুন কল যত বের হবে, অর্থাৎ বড়ো যন্ত্রের যতই উন্নতি হবে, সেই কল চালাতে ততই কম লোকের দবকাব হবে, ততই দেশের লোক পয়সা রোজগার করতে না পেবে গরিব হ'য়ে পড়বে। যন্ত্রের উন্নতি হয় বেশী জিনিস করাব জন্যে। দেশে বড়লোক আর কয়জন, সুতরাং জিনিস তৈরী হয় সাধারণ লোকের মধ্যে বেচবার জন্যেই। ওদিকে, একটু আগেই বুঝেছো বেশী কলকব্জা আমদানীর জন্যেই এই সব সাধারণ লোকেরা গরিব হ'য়ে পড়তে বাধ্য হয়। সুতরাং তারা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিও পয়সার অভাবে কিনতে পারে না।

এই বিপদের সামনে পড়েছে আজকের দুনিয়ার প্রায় সব দেশ। আমেরিকার কথা ধরো। সেই দেশের মানুষের জন্যে যত রকমের জিনিস প্রয়োজন হয়, আমেরিকায় তার প্রায় পঁচিশ গুণ জিনিস তৈরী হয়। আমেরিকা হোলো পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী দেশ, কিন্তু আজকে সেই আমেরিকায় চুয়াত্তব লাখ লোক বেকার অর্থাৎ তাদের কোনো রকম আয়

নেই, এবং প্রয়োজনমতো পয়সাও পাচ্ছে না ব'লে লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মঘট করে। আবার দেখো, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী-লোকেরা আমেরিকাতেই থাকে। কলে যারা কাজ করে, তাদের কিছু পয়সা দেওয়া ছাড়া আব কাবখানাব জন্যে কিছু খবচ করা ছাড়া, বাকী সব লাভেব টাকাটাই যায় ধনী মালিকের সঞ্চয়-ভাণ্ডারে। অতএব বুঝতে পারছো, বড়ো যন্ত্র বড়লোককে ক্রমেই আরো বড়লোক ক'রে তোলে এবং গরিবকে ক্রমেই আরো গবিব ক'বে ফেলে।

উপায় কি?—এই বিপদেব অথই জলে দুনিয়াব মানুষগুলো যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, ভারতেব গণদেবতা গান্ধীজী তখন উপায় বাত্‌লে দিলেন। তিনি বললেন, বড়ো বড়ো যন্ত্র আর কাবখানা নিয়েই যখন এত গণ্ডগোল, ক্রমশ এগুলোকে তুলেই দেওয়া যাক্ না বাপু, তা হ'লেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

কথাটা বুঝিয়ে বলি। বুঝিয়ে বলছি এইজন্যে যে, গান্ধীজীর এই কথাটা সম্বন্ধে অনেকেই একটা ভুল ক'বে থাকেন। অনেকেই ভাবেন, গান্ধীজী বুঝি সমস্ত বকম যন্ত্রকেই তুলে দিতে বলেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, এতবড় একটা দেশেব জন্যে যিনি সারা জীবন ধ'বে ভাবছেন, এরকম একটা পাগলামি করা তাঁব পক্ষে সম্ভব নয়। আসল কথাটা হচ্ছে অন্য রকম। মাত্র কয়েকজন লোক কয়েকটি মাত্র যন্ত্রের সাহায্যে সকলের জন্যে যত জিনিস তৈরী করে, সকলে যদি

নিজের নিজের জন্যে সেই জিনিসগুলো নিজেরাই তৈবী ক'রে নেয়, প্রয়োজনের জিনিসপত্রের জন্যে তাদের তা হ'লে বড়োলোকেব মুখেব দিকে চেয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু নিজের জন্যে সব কাজ কবা সব সময় তো শুধু হাতে হ'য়ে ওঠে না, সুতবাং দবকাব হ'লে যন্ত্রেব ব্যবহার করতে হবে বৈকি, কিন্তু সেইসব যন্ত্র যেন বড়ো যন্ত্র না হ'য়ে ছোট যন্ত্র হয়। একটা উদাহবণ দিচ্ছি। আমাদেব পোষাক-পবিচ্ছদগুলো যদি বড়ো কোনো কাবখানায় সেলাই কবা হোতো, তবে সেগুলো কিনতে বেশী পয়সাব দবকাব হোতো; কিন্তু সে জায়গায় সাধাবণ দর্জিবা এবং আমাদেব মা-বোনেবা এক-একটি মাত্র ছোট সেলাইএব কল দিয়েই আমাদেব পোষাক-পরিচ্ছদগুলো সেলাই ক'বে নিতে পাবেন, এতে খরচ অত্যন্ত কম পড়ে। এইবকম জায়গায় গান্ধীজীব মত হোলো, ছোট ছোট সেলাইএব কল কিনতে পারো, তাই দিয়ে কাজ করে নাও, সেলাইএব কাবখানা কোবো না। কিন্তু এই সেলাইএব কল তৈরী কববাব জন্যে একটা কারখানা দরকার হয়। সে কাবখানা তৈবী কবতে হবে বৈকি। অর্থাৎ, বড়ো যন্ত্রের ক্ষমতা যথাসম্ভব কমিয়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র যে জায়গায় না হলে নয়, সে জায়গায়ই কাবখানা করতে হবে।

খাওয়া আব পবা—এই দুটোই হোলো মানুষের সবচেয়ে দবকাবী। শুধুমাত্র এ দুটোর জন্যেই গরিবেব মাথা বড়লোকেব কাছে কেনা থাকে। এই দুটোর জন্যে যদি মানুষের

ভাবনা না থাকে, তবে মানুষকে অন্যায়ভাবে দাবিয়ে রাখার ক্ষমতা কারও থাকে না। কাপড়ের সমস্যা তো অতি সহজেই মেটানো যায়,—প্রত্যেক লোকে চরখা চালিয়ে সুতো তৈবী ক'রে তাব পবার ব্যবস্থাটুকু ক'বে নিতে পারে। এতে অনেকগুলো উপকার হয় ঃ—

(ক) কাপড়েব জন্যে ভাবনা কাবও কোনোদিন কবতে হবে না।

(খ) বিদেশেব কোনো জাতি এ দেশে কাপড় বিক্রি ক'বে পয়সা লুঠতে পাববে না।

(গ) কোটি কোটি লোকেব কাপড় বুনে লাখ লাখ তাঁতি খেতে পেয়ে বাঁচবে।

(ঘ) নিজেব কাপড়ের সুতো নিজে কাটলে সে কাপড়েব দামও খুব কম পড়বে।···ইত্যাদি।

যন্ত্রেব উপব গান্ধীজীর আসলে বাগ নেই। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'যে যন্ত্র সকলেব উপকারে লাগবে, যে যন্ত্র সকলেব জন্যে সৃষ্টি হয়, তাকে আমি সাদবে গ্রহণ করবো।' বড়ো বড়ো কয়েকটা যন্ত্র মানুষেব দবকাবী জিনিসগুলো হয় তো তৈরী কবতে পারে, কিন্তু সেই সব জিনিস কেনবার মতন যথেষ্ট পয়সা তো আর যন্ত্র দিতে পাবে না। কিন্তু জিনিস-গুলো যদি সকলে নিজেরটা নিজে যথাসম্ভব তৈরী ক'রে নেয়, তা হ'লে তো মানুষের আর এত মুশকিলে পড়তে হয় না। কিছু লোক কয়েকটা যন্ত্রের সাহায্যে সকলের জন্যে দরকারী

জিনিস তৈরী ক’রে কেবলমাত্র তাদের নিজেদের খাওয়া-পবাই জোগাড় কবতে পারে—সকলে যদি কাজ করতে না পায়, সকলে তো খেতে পবতে পাবে না, এবং যন্ত্র যদি বেশী আমদানি হয়, সকলে কাজ পেতেও পাববে না। আমাদেব দেশের সমস্যা হচ্ছে সকলকে কাজ দেওয়া—যন্ত্রের আমদানি ক’বে মাত্র কয়েকজনকে কাজ দিয়ে বাকী লোকেব কাজ কমানো নয়।

আরো একটা কথা। কারখানাব সংখ্যা বাড়লেই যে বেশী লোক কাজ পেয়ে খেতে পবতে পাবে, তা নয়। অনেক সময় উল্টো হয়। কাবখানা বেড়েই চলে, কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার বদলে কমে যায়। আমাদেব দেশ ভাবতবর্ষেব কথাই ধবা যাক্। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভাবতবর্ষে যত কাবখানা ছিলো, এখন কাবখানার সংখ্যা প্রায় তাব চারগুণ হয়েছে। তখন কারখানায় কাজ কবতো দেশের লোকের শতকরা এগাবো জন। এখন কাজ কবে শতকরা নয় জন—শতকবা দু’জন শ্রমিক ক’মে গেছে এই কয় বছবের মধ্যে। এব প্রধান কাবণ হোলো বড়ো যন্ত্রেব আবিষ্কাব। নতুন বড়ো-যন্ত্র আবিষ্কার করাই হয় কম লোক দিয়ে বেশী জিনিস তৈবী কবাবার জন্যে। সুতবাং নতুন বড়ো যন্ত্র যত বেশী আবিষ্কার হবে, ততই কম লোক কাজ পাবে।

এখন ভারতবর্ষে প্রায় আট কোটি লোক বেকার। অনেকে ভাবেন, আরো অনেকগুলো কারখানা খুললেই তো সেই সব

লোক কাজ পাবে। তাঁরা ভাবেন, লোককে বেকার ক'রে দেওয়া যন্ত্রের দোষ নয়, দোষ মালিকের। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান, বৈজ্ঞানিকেরা চুপ ক'রে ব'সে নেই—একখানা যন্ত্র দিয়ে অনেকগুলো লোকের কাজ করাবার জন্যে যন্ত্র তারা আবিষ্কার করেই চলেছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কাপড়ের কলে কাপড়গুলো কাচাবার জন্যে আর ইস্তিরি করাবার জন্যে অনেকগুলো ধোপা রাখা হোতো। হাজার হাজার ধোপা এতে খেতে পরতে পেতো। কিন্তু কাপড় কাচবার যন্ত্র আবিষ্কার হয়ে গেলো। ইস্তিরি করবার জন্যেও 'ক্যালেণ্ডার' ব'লে একরকম বিরাট যন্ত্র আবিষ্কার হোলো। এই কল চালাতে মাত্র কয়েকজন লোকের দরকার হয়। বাকী শত শত ধোপার কাজ গেলো। দেখো, যন্ত্র আবিষ্কার হোলো, কিন্তু তাতে লোকের কাজ জোগাড় হওয়া তো দূরে থাক, বরং বহু লোকের কাজ গেলো। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ আগরওয়াল তাঁর 'গান্ধীয়ান প্ল্যান' বা গান্ধী-পরিকল্পনা বইয়ে লিখছেন, ভারতবর্ষের লোকেদের জন্যে দরকারী সব রকম জিনিস তৈরী করবার জন্যে যদি আরও অনেকগুলো কারখানা খোলা যায়, তা হলেও বড় জোর আর কয়েক লাখ লোক কাজ পাবে, তার বেশী নয়। অথচ ভারতে বেকারের সংখ্যা আট কোটি।

বড়ো বড়ো যন্ত্রের ওপর গান্ধীজীর রাগের আরো একটা কারণ আছে। কলে যারা কাজ করে, কলে কাজ করতে

করতে তারাও ক্রমে এক-একটি কল হ'য়ে পড়ে। কলের যেমন প্রাণ থাকে না, এই সব লোকেরও তেমন প্রাণ অর্থাৎ উৎসাহ থাকে না পৃথিবীর আনন্দকে ভোগ করবার। কলেরই মতন যতটুকু কাজ তাদের করবার ততটুকু কোন রকমে ক'রে এসে মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে থাকে বাড়ীতে। তাদের মেজাজ হ'য়ে ওঠে কড়া, চেহারা হ'য়ে ওঠে কঙ্কালসার। চেহারা ভালো রাখবার জন্যে যে পয়সার দরকার, মালিক তো তাদের তা দেবে না—চেহারা তো কঙ্কালসার হবেই। তাদের ছোট্ট ঘরের বাইরেও যে একটা সুন্দর, আনন্দে-ভরা পৃথিবী আছে, বাইরেও যে রয়েছে এত আলো, এত বাতাস, প্রকৃতির এত শোভা—সে কথা তারা ভুলে যেতে বাধ্য হয়।

যন্ত্র যে মানুষকে 'মানুষ' রাখে না—এই মত একা গান্ধীজীর নয়, পৃথিবীর অনেক পণ্ডিতলোকেরও তাই মত। পৃথিবীর একজন মস্তবড়ো অর্থনীতিবিদ—অ্যাডাম্ স্মিথ্ বলেছেন, 'একটা লোক চিরকাল কলে খেটে গেলে সে নিরেট এবং বোকা হ'যে পড়তে বাধ্য!' সাম্যবাদের আবিষ্কর্তা কার্ল মার্ক্স তাঁর 'ক্যাপিটাল' নামক বইতে এক জায়গায় বলছেন, 'যন্ত্র মানুষকে এক-একটি পঙ্গুদানবে পরিণত করে; কলে কাজ করতে করতে সেও যন্ত্রেরই একটা অংশের মতো হ'য়ে পড়ে।' এই রকম পৃথিবীর অনেক পণ্ডিতলোক যন্ত্র সম্বন্ধে নানারকম নিন্দা ক'রে গেছেন। বিখ্যাত মহিলা-পণ্ডিত মেরি সাদারল্যাণ্ড তাঁর 'ভিক্টেরি অব্ ভেস্টেড ইন্টারেষ্ট'

নামক বইএ বলেছেন, 'এখনকাব কারখানাগুলোর কাজ মানুষেব সত্যিকার সৃষ্টির শক্তিকে নষ্ট ক'রে ফেলে। কারখানার আবহাওয়া তাব জন্যে দায়ী নয় শুধু, কারখানার কাজগুলোই মানুষকে নষ্ট ক'বে দেবাব মতো।' প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক গোল্ডস্মিথ বলেছেন, 'কারখানার দ্বাবা কয়েকজনের টাকা বেড়ে ওঠে আর 'মানুষ'এব ক্ষয় হয়।' এই বকম, পৃথিবীর আবো অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, যথা—রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, প্রাক্তন কংগ্রেস-সভাপতি জে বি কৃপালনী, ডেভিড বিকার্ডো, প্রিন্স ক্রোপট্‌কিন, জর্জ বার্নার্ডশ, প্রফেসর শিল্ড, মনোবিজ্ঞানী আর্নেষ্ট হাস্‌ট্‌, বোরসোডি প্রভৃতি যন্ত্রের কুফল সম্বন্ধে নানা কথা বলেছেন।

গান্ধীজী সকলকে যথাসম্ভব নিজেব কাজ নিজেই ক'রে নিতে বলেছেন। এই সব ছোট ছোট কাজ, যা ঘবে বসেই কবা যায়, তাকে বলা হয় কুটিবশিল্প। বড়ো যন্ত্র দিয়ে আমরা অনেক জিনিস পাই বটে, কিন্তু বড়ো যন্ত্র যে বেশী লোককে কাজ দিয়ে তাব ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করতে পারে না—সেইটাই গান্ধীজী আমাদেব চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। আমাদেব দেশেব মস্তবড়ো একজন সংখ্যাগণিতজ্ঞ শ্রীযুক্ত আব ভি রাও একটা হিসাবে দেখিয়েছেন, আমাদের দেশে কারখানায় কাজ করে সতেরো-আঠারো লাখ লোক, আব সে জায়গায় কুটিরশিল্পে কাজ করে প্রায় সত্তর লক্ষ লোক। যারা কুটিরশিল্পে কাজ করে, তাদের প্রায় সবাই কারখানার-

শ্রমিকদের চেয়ে বেশী আয় করে। শুধু আয় করা নয়, কারখানার লোকদের চেয়ে তারা অনেক সুখেও থাকে। চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবারে বহু লোকের একমাত্র কাজ চরকায় সুতো কাটা, চরকা তৈরী করা, তাঁত-বোনা— এইসব কুটিরশিল্প। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজী সেখানে গিয়েছিলেন, তারা গান্ধীজীকে চাঁদা তুলে পঁচিশ হাজার টাকা উপহার দিয়েছিলো। কিন্তু নিজেদের আয়ে যাদের নিজেদেরই খরচ কুলোয় না, সেই সব কারখানা শ্রমিকদের পক্ষে কোন কাজে এই রকম বিরাট চাঁদা দেওয়া সম্ভব নয়।

কলে তৈরী জিনিস অনেকগুলো কারণে একটু কম দামে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই কমদামী জিনিস কেনবার মতন কম-পয়সাও যখন কল মানুষকে দিতে পারে না, তখন সেই বড়ো বড়ো কলগুলোকে আমাদের ছাড়তেই হবে। সস্তা হলেই তো আর হোলো না। তার পেছনে আমাদের ভালো, আমাদের মঙ্গলটাকেও দেখতে হবে। ভূমিকম্পে বাড়ি ভেঙে গেলে ইট সস্তা হয়, আগুনে ঘর পুড়ে গেলে কাঠকয়লা সস্তা হয় সত্যি, কিন্তু তবু ইট-কাঠকয়লা সস্তায় পাবার জন্যে বাড়ি ভেঙে যাওয়া বা ঘর পুড়ে যাওয়া এর কোনোটাই আমাদের পক্ষে কল্যাণের নয়। খদ্দর এখনো অনেকে শখ ক'রে কিনে পরে, কিন্তু ভেবে দেখো, যদি সব লোকে প্রতিদিন মাত্র এক ঘণ্টা সময় চরকায় সুতো কাটে, তা হ'লে নিজের কাপড়ের বা

পোশাকের সুতোটা সে তৈরী ক'রে নিতে পারে। তারপর সেই সুতো দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিলেই হোলো। পয়সার চেয়েও আমাদের জীবনের দাম অনেক বেশী। সত্যিকার মানুষের মত বেঁচে থাকতে হলে জীবনকে সম্মান দিতে হবে, পয়সার কাছে জীবনকে বেচে দিলে তো চলবে না। গান্ধীজী এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর কথা বলেছেন—'আমরা যদি আমাদের বুড়ো অকেজো বাপ-মাকে বা আমাদের অকেজো ছেলে-পুলেকে মেরে ফেলি, তবে তো আমাদের অনেক খরচ বেঁচে যায়। কিন্তু তা তো আমরা মারিই না, বরং যথাসাধ্য খবচপত্র ক'রে তাদের আমরা পালন করি।' সেই রকম, আমাদের যদি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে হয়, তা হ'লে কয়েকটা মাত্র যন্ত্রেব কাছে মাথা নুইয়ে দিলে চলবে না। নিজেদেব কাজ যথাসম্ভব নিজেরা ক'রে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবো। খদ্দরেব কাপড় হয়তো একটু মোটা হয়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সুতো কাটতে কাটতে আমাদের হাত দিয়েই খুব সরু সুতো বাব হবে। মনে রেখো, ঢাকার মস্‌লিন, যার মতো পাতলা কাপড় পৃথিবীতে তৈরী হয়নি কোনাদিন, তার সুতো আমাদের দেশের লোকের হাতেই কাটা।

গান্ধীজী বলেছেন, 'যন্ত্রকে ঘৃণা করবো কেন? যে চরকা কাটতে সবাইকে আমি বলছি, সেই চরকাও তো একটা যন্ত্র।' আবাব বলেছেন, 'যে যন্ত্র অনেককে ঠকিয়ে মাত্র কয়েকজনকে বড়লোক ক'রে তোলে, সে যন্ত্র আমি চাই না! কোটি কোটি

ভারতবাসীকে যে যন্ত্র খেতে দেবে, সে যন্ত্রকে আমি নিশ্চয়ই চাইবো।' আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'বড় বড় কয়েকটা যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন মাত্র লোক সমস্ত লোকের পিঠে চেপে বসেছে। যন্ত্র যে সব কাজ করে, সেই কাজগুলো মানুষকে নিজ হাতে ক'রে নিতে হবে, আর এইভাবে সেই কয়েকজন লোককে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে সকলের সাথে সমান ক'রে দিতে হবে। নিজেকে নিজে গ'ড়ে তুললে বঞ্চকের দল আপনা থেকেই স'রে যাবে।'

সবশেষে একটা বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করতে বলছি তোমাদের। এই যে কুটিরশিল্প—ছোট ছোট যন্ত্র দিয়ে কাজ করা—এর সঙ্গেও অহিংসার গভীর সংযোগ রয়েছে। কুটির-শিল্পে বা ছোট যন্ত্রে উৎপাদন মানেই হচ্ছে সকলের জন্যে সকলের উৎপাদন। এতে বেশী উৎপাদন করবার নেশা জাগতে পারে না মনে, সুতরাং বাড়তি মাল বেচবার জন্যে বিদেশে বাজার খোঁজবারও দরকার পড়বে না। পরের দেশে জেঁকে বসবার লোভও আসবে না। যুদ্ধকে অনেকটা এড়ানো যাবে। কুটিরশিল্পে সকলেই কাজ করতে পারবে ব'লে, একজন আর-একজনের উপর অত্যাচার করবার সুযোগও পাবে না। অত্যাচার করবার সুযোগ না পেলেই হিংসাও জাগবে না মনে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মানুষকে অহিংস ক'রে তোলার জন্যেও কুটিরশিল্পের দরকার অত্যন্ত বেশী।

টাকা আর ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া

টাকা আর ক্ষমতা ছড়িয়ে দেওয়া—ওপরেব এই কথাটা দেখে হয়তো ব্যাপাবটা অদ্ভুত লাগছে। সমস্ত পৃথিবীতে এই যে এত ঝগড়া, এত অশান্তি, এত যুদ্ধ—সবই হচ্ছে এই টাকা আব ক্ষমতা ছড়ানো নেই ব'লে। টাকা আব ক্ষমতা—মাত্র এই দুটি জিনিস যদি জমা না থেকে ছড়িয়ে থাকতো সবাইএর কাছে, মানুষের কোনো দুঃখ, কোনো রকম অভাব-অভিযোগ তা হ'লে আর থাকতো না; মানুষ সত্যিকারের মানুষের মতো বাঁচতে পারতো; ১৩৫০ সালের মন্বন্তরও তা হ'লে হোতো না—লাখো লাখো লোকও মাবা যেতো না তা হ'লে না-খেয়ে আর যুদ্ধে।

ব্যাপাবটা পরিষ্কার ক'রে বলি। সব দেশে, টাকা কয়েকজন বড়লোকের হাতে জমা হ'য়ে থাকে। সেই টাকা তারা তো আর বাক্সে ফেলে রাখে না, তা দিয়ে আরো যাতে টাকা আসে, তার ব্যবস্থা করে—বড় বড় কারখানা করে, বড় বড় ব্যবসা ইত্যাদি করে। এই সব কারখানা আব বড়-লোকেব ব্যবসাগুলো কি ক'বে সাধারণ লোককে ক্রমেই গরিব ক'রে তোলে, তা তোমরা আগেব প্রবন্ধে বুঝতে পেরেছো। সব লোকের হাতে তো টাকা জমা নেই, সুতরাং

খেয়ে পরে বাঁচবার জন্যে বড়লোকের দাসত্ব করতে তারা বাধ্য হয়। হয়তো তাদের ওপব অত্যাচার চলে, অবিচার চলে সেই সব বড়লোকদেব, কিন্তু কোনো কথা তারা মুখ ফুটে বলতে ভয় পায়, কাবণ, যে-বড়লোকেব দাসত্ব সে করছে, সে যদি তাব ওপর রাগ কবে, তবে তো তার ভাত বন্ধ হবার সম্ভাবনা। আমাদের দেশেও কত জায়গায় শ্রমিকেরা ধর্মঘট কবে, তারা কয়েকদিন ধর্মঘট করাব পরই আবার কাজে ঢুকে পড়তে চায়। কারণ, বড়লোকের অধীনে কাজ যদি না কবে, তাদের খেতে দেবে কে?

আগেই বলেছি, এই সমস্ত কারখানার মালিকেরা নিত্য-নতুন যন্ত্র কেনে—মাল বেশী তৈবী করবার জন্যে। কিন্তু তোমরা জানো যন্ত্রেব জন্যই দেশের লোক কি রকম গবিব হ'য়ে পড়ে। তাবা তাই সে-সব জিনিস কিনতে পারে না। আব তা ছাড়া, দেশেব লোকেব যতটুকু জিনিস দরকাব, কেবলমাত্র ততটুকু তৈরী ক'রেই তো আর কারখানার মালিকেরা চুপ ক'রে ব'সে থাকবে না! তারা চাইবে, অনেক বেশী মাল তৈরী ক'রে দেশেব বাইবেও বেচে পয়সা আনতে। এই অনেক মাল তৈবী করার নেশা যখন কারখানার মালিক-গুলোকে পেয়ে বসে, তখন তারা সেই সব বেশী মাল বেচবার জন্যে বিদেশে বাজার খোঁজে। বিদেশে গিয়ে বেচলেই তো আব হোলো না—সে দেশের শাসকেরা তা করতে দেবেই বা কেন? সুতরাং যুদ্ধ লাগে—কারখানার

মালিকেরা যে দেশে থাকে, সে দেশের সঙ্গে নতুন দেশের। কারখানার মালিকদেব দেশের রাজা তো যুদ্ধ করবেই মালিকদের জন্যে, কারণ, রাজা হোলো এই সব কারখানা বা ব্যবসার বা জমিব মালিকেরও মালিক। সুতরাং এই সব মালিকদের যদি ক্ষমতা ক'মে যায়, তা হ'লে তো রাজারই ক্ষমতা যাবে ক'মে। যে সব দেশ এইভাবে অধিকাব ক'রে বাজার হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে বলা হয় উপনিবেশ। আমাদেব দেশ ভারতবর্ষও ছিল ইংরেজদের উপনিবেশ।

এই উপনিবেশ জোগাড় কববাব জন্যে পৃথিবীর সব জাতি ক্রমেই ব্যস্ত হ'য়ে উঠছে। এই নিয়েই লাগে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ—দেশে দেশে লড়াই। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং সদ্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হোলো, তাও লেগেছিল এই উপনিবেশের নেশার জন্যই। সুতবাং দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দেশেব ভিতবের বা সমস্ত দুনিয়াব অশান্তি, সবেবই কাবণ টাকা আব ক্ষমতা ছড়িয়ে না থাকা। টাকা বেশী থাকলেই ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে আসে, সেই টাকা দিয়ে আরো টাকা আয় কববার নেশা চেপে বসে। এই নেশাই জাগিয়ে তোলে উপনিবেশের লোভ, আর তা থেকেই আসে যুদ্ধ।

এখন এই টাকা আর ক্ষমতা তো জমা হ'য়ে থাকে মাত্র কয়েকটি লোকের হাতে। তাদের কাছে থেকে টাকা চাইলেই তো আর তারা সকলের হাতে তা তুলে দেবে না, অথচ

তাদের সঞ্চয়ভাণ্ডাবের জমা টাকাগুলো আব তাদের ক্ষমতা সকলেব হাতে ছড়িয়ে না দিতে পারলে, সমস্ত মানুষ-জাতটাই যাবে ধ্বংস হ'য়ে। এই টাকা আব ক্ষমতা ছড়িয়ে দেবার নানা বকম উপায় নানা পণ্ডিতলোকে বলে গেছেন। কিন্তু সেগুলোতে দোষত্রুটি ছিল বহু, তাই সে সব উপায় দিয়ে টাকা আর ক্ষমতা সত্যিই ছড়িয়ে পড়েনি।

গান্ধীজী দেখিযে দিলেন সত্যিকাবেব উপায়। তিনি বললেন—শহবে থেকে সাহেবিআনা ক'রে সত্যি সত্যি স্বাধীনতা পাওয়া যায না। আমাদেব জাতি যে আজ শুকিয়ে, কুঁকড়ে ম'বে যেতে বসেছে, সে শুধু পল্লীগ্রাম থেকে শহরে চলে আসাব জন্যে। ভাবতে লক্ষ লক্ষ গ্রাম, যেগুলো একদিন সকলকে খেতে দিতো, আজ সেগুলো জঙ্গলে ভবা। গ্রামেব লোক আজ শহবে এসে না খেয়ে মরছে, তবু তারা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে না। গান্ধীজী বললেন, এই সব পবিত্যক্ত গ্রামে লোকদের ফিবে যেতে হবে, আবাব সেগুলোকে আগের মতো ক'বে তুলতে হবে। বাষ্ট্রেব বা রাজ্যেব শক্তি, যা এখন শুধু শহবেব মধ্যেই আবদ্ধ বয়েছে, সেটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে। আজকের দিনে মাত্র কয়েকজনের কথায় সমস্ত দেশের লোককে চলতে হচ্ছে, কিন্তু এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দেশের লোকেব কথাতেই সাবা দেশ চলে।

দুনিয়ার সর্বত্রই দেশ আসলে চালায় মাত্র কয়েকজনে। এ-কয়েকজন যা করবে, তাই হবে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

করবার বা কিছু বলবার ক্ষমতা দেশের সাধাবণ কোনো লোকের থাকে না। সুতবাং এখনকাব দেশগুলির স্বাধীনতা থাকার মানে হচ্ছে, সেই কয়েকজন মাত্র লোকের যা-খুশি করবাব ক্ষমতা -থাকা। কিন্তু যে দেশে সাধারণ লোকেই পেট ভ'বে খেতে পাবলো না, যতটুকু প্রাপ্য ততটুকুও পাবার তার অধিকার বইলো না, শাসনকর্তাদের যা-খুশি কাজের সমালোচনা করবাব শক্তিও যে-দেশেব লোকেব নেই, মাত্র কয়েকটি লোকের দয়াব উপর যে-দেশের লোকেব সমস্ত জীবন কাটাতে হয়, সে দেশকে স্বাধীন কি ক'বে বলবো? সাধারণ লোক নিয়েই তো দেশ, তারাই যদি সব রকমে সত্যিকারের স্বাধীনতা না পেলো, তবে তাকে কিছুতেই স্বাধীনতা বলা যাবে না। আমেরিকা তো স্বাধীন দেশ, ইংলণ্ড তো স্বাধীন দেশ, তবে কেন সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক বেকাব, কেন সেখানে এত দুঃখকষ্ট? এই বকম নকল স্বাধীনতা আজকের দুনিয়ায় সাধাবণ লোকেবা চায় না। তারা চায় সত্যিকারের স্বাধীনতা —যাতে অভাব থাকবে না, ভয় থাকবে না, তাদের কথা বলবার পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং নিজেব নিজের ধর্ম পালন করতে কেউ বাধা দেবে না। এই রকম স্বাধীনতা পাবার জন্যে লড়তে হবে সবাইকে গান্ধীজীর দেখানো বাস্তায়।

'কম্যুনিজম্' বা সাম্যবাদের আবিষ্কর্তা কার্ল মার্ক্স্‌এর দেখানো পথ ধ'রে চ'লে রাশিয়া আজ জনগণের জন্যে স্বাধীনতা এনেছে। খেতে পরতে সবাই পারছে বটে, কিন্তু

সেখানেও একটা মস্ত দোষ এসে পড়েছে, যা থেকে হয়তো রাশিয়াব লোকের এই সুখটুকুও থাকবে না। বাশিয়াও চলছে সে দেশের সব লোকের কথায় নয়, সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন নেতার কথায়। এই সব নেতার বিরুদ্ধে কথা বলবার সাধ্য কাবও নেই—তা যত অন্যায়ই নেতারা করুক-না কেন! যে-ই বলতে গেছে সেই কয়েকটি লোকের বিরুদ্ধে কোনো কথা, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এব নাম কি সত্যিকারের স্বাধীনতা?

এব পরের এক প্রবন্ধে যে আঠারোটা কাজের কথা বলছি, সেই কাজেব ভেতব দিয়ে এগোলে আমবা সত্যিকারের স্বাধীনতা পাবো—গান্ধীজী বলেছেন এই কথা। তিনি বলেছেন, ভাত আর কাপড় এই দুটোই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে দরকাবী জিনিস। সব দেশে এই দুটি জিনিসেব জন্যেই লোকে চেয়ে থাকে মাত্র কয়েকজন লোকের দিকে—তারা হোলো রাজ্যের শাসনকর্তা। সুতবাং এই খাওয়া এবং পরার কলকাঠিই যখন শাসনকর্তাদেব হাতে রয়ে গেলো, তারা যা-খুশি কবাতে পারে বাজ্যের লোকেদেব দিয়ে। শুধুমাত্র কয়েক-জনের স্বার্থের জন্যে হয়তো রাজ্যের লাখ লাখ লোককে যুদ্ধে নামতে হয় বাধ্য হয়ে। সেও শুধু এই ভাত-কাপড়ের জন্যেই। সুতরাং, এই যে সাধারণ লোকের ওপর রাষ্ট্রের কর্তাদের অত্যাচার করবাব ক্ষমতা, এটা কেড়ে নিলেই গোলমাল চুকে যায়—দেশেব লোকেরা স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দভাবে চলতে

পারে। এই অত্যাচার করবার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া মানেই হচ্ছে, ভাত আর কাপড়ের ব্যবস্থাটা নিজেদের হাতে নিয়ে আসা। কাপড়ের ব্যবস্থাটা তো অতি সহজেই করা যায়—চবকায় সুতো কেটে তাই দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিলেই হোলো। কয়েকটা গ্রাম মিলে পঞ্চায়েত গ'ড়ে যদি তাদের খাবাব বন্দোবস্ত নিজেরাই ক'রে নেয়, তা হ'লে খাওয়াব ব্যবস্থাও হ'য়ে যায় সহজে। নিজেদেব যা কাজ, সেগুলো নিজেরাই ক'বে নেবে৷ গ্রামেব ভেতবে থেকে।

বাজ্য চালাবে দেশের লোকেবা। পঞ্চায়েতেব লোকেরা ভোট দিয়ে তাদেব পছন্দমত একজন ক'বে লোক জেলাব শাসন-পবিষদে পাঠাবে। জেলাব শাসন-পবিষদের লোকেবা আবাব ভোট দিয়ে তাদের পছন্দমত লোককে পাঠাবে প্রদেশেব শাসন-পরিষদে। প্রদেশেব শাসন-পবিষদগুলোও আবাব ঐ ভাবে তাদেব লোক পাঠাবে দেশেব কেন্দ্রীয় পবিষদে অর্থাৎ প্রধান শাসন-পরিষদে। সেখানকার সদস্যবাই ঠিক কববে বাষ্ট্রপতি কে হবে। এখন এই শাসন-পরিষদের হাতে রইলো সমস্ত দেশেব ভালোর ব্যবস্থা করাব ভাব, লোককে সুখী কববাব ভার। কিন্তু, দেশের লোকেবাই তাদেব যখন ঠিক করলো ভোট দিয়ে, তখন দেশেব সাধাবণ লোকেই হোলো দেশের পরিচালক। এই কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদের লোকেরাও তাদের যা-খুশি করতে পারবে না, কাবণ, লোকের খাওয়া-পরার কলকাঠি তো তাদের হাতে

নেই। রাশিয়াতেও শাসন-পরিষদ এইভাবেই ঠিক হয় বটে, কিন্তু শাসন-পরিষদের কয়েকজন মাত্র লোকের হাতে সমস্ত দেশের লোকের খাওয়া-পবাব ক্ষমতা থাকে ব'লে দেশের সব লোককে মাত্র কয়েকজন লোকেব কথা বাধ্য হ'য়ে শুনে চলতেই হয়—তা তাবা যা-খুশি করুক-না কেন!

গান্ধীজী বলেছেন, 'আঠারো দফা কাজেব ভেতব দিয়ে যে অবস্থায় আমরা পৌছবো, তাতে সত্যিকাবের স্বাধীনতা আসবে। সে অবস্থায় কেউ আলস্য করবে না, সকলেই নিজের নিজেব জন্যে কাজ কববে, বুদ্ধি বিক্রি ক'রে কেউ পয়সা রোজগাব কববে না, ধনী আব গবিবেব পার্থক্য থাকবে না। সকলেই নিজেব ক্ষমতাকে, নিজের কাজ করার শক্তিকে সকলের ভালোব জন্যে ব্যবহার কববে, সকলে সমান অধিকাব পাবে।...আঠাবো দফা গড়াব কাজের ভেতব দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে নিজেদেব ব্যবস্থা নিজেরাই ক'বে নেওয়া। এব জন্যে যদি পবেব কাছে আমরা না যাই, বড়লোকেব কাছে মাথা যদি না নোয়াই, তা হলেই বড়লোক আব বড়লোক থাকবে না, থাকতে পাবে না। তাদেব যদি আমাদের ঘাড়ের ওপব থেকে নামিয়ে দিই, তা হ'লে তারা আমাদেরই সঙ্গে সমান মাটিতে এসে দাঁড়াবে।' আবার তিনি বলছেন, 'আমি চাই—জনসাধারণ যেন সব সময়েই কেন্দ্রীয় শাসন-পবিষদের লোকদের ঠিক রাখতে পারে। স্বাধীনতার মানে এই আমি বুঝেছি, সে অবস্থায়

সাধারণ লোক ভোটে তাদের প্রতিনিধি বা শাসন-পরিষদের লোক ঠিক ক'বে কাজ চালাবে বটে, কিন্তু শাসন-পরিষদের লোকেবা যাতে যা-খুশি-তাই না করতে পারে, তার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা সাধারণের হাতে থাকবে। যদি মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা মানুষ কোনদিন পরেব হাতে তুলে না দেয়, তা হ'লেই সম্ভব। তার পবে সুখে থাকার জন্যে মানুষ যদি কিছু করতে চায়, তবে সেটা তাদের পঞ্চায়েতেব ভেতরেই করবে, বাইবের সাহায্য যথাসম্ভব কম নেবে।'

সুতরাং, আঠারো দফা গড়াব কাজের ভেতব দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমরাই আমাদেব নিজের হাতে নিজেদের ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নিয়ে আসবো। সেইটাই হবে সত্যিকারের স্বাধীনতা। যতক্ষণ নিজেদের স্বাধীনতাব জন্যে আমরা নিজেরা কাজ না করছি, ততক্ষণ কেউ আমাদের কাছে স্বাধীনতা পেড়ে এনে দেবে না গাছেব ফলেব মতো।

আঠারো দফা গড়ার কাজ

পৃথিবীবিখ্যাত ইংরেজ কবি শেইক্‌স্‌পিআর তাঁর একখানা নাটকে এমন একটা দেশের কথা কল্পনা করেছিলেন, যে দেশে কেউ গরিব নেই, সকলে খেতে পায়, সকলেই থাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে। আজকে রাশিয়া সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে তাঁর লেখার কথাটা মনে পড়লো। কবির কল্পনা সেই দেশে আজ সফল হয়েছে। রাশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ, যেখানে লোকে পেট-ভ'রে খেতে পায়, প্রাণ-ভ'রে আনন্দ পায়, মনের মতন শিক্ষার সুবিধা পায়।

শুনে বড় আনন্দ হয় মনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ এসে মন ভ'রে ফেলে। চাঁদের কলংকের মতো রাশিয়ার রাষ্ট্রের ব্যবস্থার এমন একটা দোষ চোখে পড়ে যাতে মনে হয়, চাঁদের এ আলো বুঝি আর থাকবে না, ঐ দোষটাই অমাবস্যার অন্ধকার হয়ে চাঁদটাকেই ঢেকে দেবে। মনে হয়, রাশিয়ার ঐ দোষটাই রাশিয়ার লোককে একদিন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দুঃখের বিষ-সাগরে। সেই দোষটা হচ্ছে, ক্ষমতা এক জায়গায় জমা হ'য়ে থাকা—যে দোষের কথা তোমাদের এর আগেই বলেছি। রাশিয়ার লোকও ভোট দিয়েই তাদের রাষ্ট্রের শাসন-পরিষদের কর্তা বেছে দেয় সত্যি, কিন্তু এই সব কর্তারা যাতে বিগড়ে না যায়, তার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা রাশিয়ার

লোকের হাতে নেই। এর খারাপ ফলও দেখা গেছে প্রচুর। কথা ছিলো, এই সব শাসন-পরিষদেব কর্তারা ক্রমেই রাশিয়ার সাধারণ মানুষেব হাতে ক্ষমতা ভাগ ক'বে দেবেন, কিন্তু তা তো হচ্ছেই না, ক্রমেই লোকেব হাতের ক্ষমতা সেই কয়েকজন মাত্র কর্তাব হাতে এসে পড়ছে। এই যে ক্ষমতা সাধারণের হাত থেকে কয়েকজনেব হাতে চলে যাচ্ছে, এ কথা সে-দেশেব সব সাধাবণ লোকেও বুঝতে পারছে না, যাবা বুঝতে পাবছে, তারাও কিছু করতে পাবছে না, কিছু কবতে গেলেই কর্তাবা তাকে শাস্তি দেবে—বলবে, তোমবা দেশেব শান্তি নষ্ট কবছো—রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থেব ক্ষতি করছো। তাই আজ যখন রাশিয়াকেও জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে পৃথিবীব সর্বনাশা যুদ্ধেব সঙ্গে—তুনিয়াব অশান্তির সঙ্গে, তখনও সে-দেশের লোক তাকে এড়াতে পাবছে না, লাখে লাখে লোক প্রাণ দিচ্ছে তাই মাত্র কয়েকজনেব কথায়। কিন্তু লোকদের হাতে যদি ক্ষমতা থাকতো, তা হ'লে মাত্র কয়েকজনেব কথায় দেশের লোককে চলতে হোতো না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, লোকদের হাতে আগে থেকেই ক্ষমতা ছিলো না ব'লেই এত গণ্ডগোল হচ্ছে। গান্ধীজীব কথা হোলো, 'আগে আমরা কয়েকজন কর্তা হ'য়ে বসি, পরে সব লোকের হাতে ক্ষমতা ছড়িয়ে দেবো—এটা বাজে কথা, কোনো দেশে কোনো কালে তা সম্ভব হবে না। লোকেদেব হাতে ক্ষমতা আগে থেকেই চলে আসা উচিত।'

এখন এই গোড়া থেকেই ক্ষমতা সাধারণ লোকের হাতে এসে যাওয়াব উপায় কি? সেটা হচ্ছে, 'গড়ার কাজ।' গান্ধীজী আঠারোটা কাজের কথা বলেছেন। এই সমস্ত কাজের ভেতব দিয়ে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে—নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে আসাব ব্যবস্থা নিজেরাই করা।

সেই আঠারোটা কাজের কথা সংক্ষেপে জানাচ্ছি :

(১) জাতে জাতে মিল—জাত বলতে এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন, এ সব সম্প্রদায়েব কথা বোঝাতে চাইছি। আমাদের স্বাধীনতাব জন্যে জাতে জাতে মিলে-মিশে থাকাটা খুবই দরকাবী। যাবা 'গড়ার কাজ' করবে, তারা মনে মনে ভাববে, 'আমাব মধ্যেই হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, পার্শী, সব আছে।' সব ধর্মেব প্রতি সমান শ্রদ্ধা বাখতে হবে, কারণ, সব ধর্মেরই আসল কথা ভগবানের উপাসনা। গড়াব কাজ যাবা করবে, তাবা অন্য জাতেব লোকেব সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে, তাদের আলাদা ক'রে রেখে দিলে চলবে না।

(২) অস্পৃশ্যতা দূর করা—বড় জাত ছোট জাতকে ছোঁবে না, বামুন শূদ্রের হাতে জল খাবে না—এই সমস্ত নীচু স্বভাবগুলো ছাড়তে হবে। ভাবতবর্ষে সব জাতকে, বিশেষ ক'বে হিন্দুজাতকে এই দোষটা একেবারে সর্বনাশের মুখে নিয়ে এসেছে। ভারতবর্ষ যে আজ তুনিয়ার সব জাতিগুলো থেকে পেছিয়ে প'ড়ে আছে, এই দোষটা তার একটা বড়ো কারণ।

ছোট জাতদের সঙ্গে মিশতে হবে, তাদের উন্নতি ক'বে, তাদের ও আমাদের এক হ'য়ে যেতে হবে। আমাদেব অহংকার গর্ব সব ছেড়ে দিয়ে 'হরিজন'দেব সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, তাদেব ভাই বলে ডেকে নিতে হবে।

(৩) **মদ ইত্যাদি উঠিয়ে দেওয়া**—আমাদেব জাতেব সর্বনাশেব মূলে একটা কারণ মদ, তাড়ি, আফিং, গাঁজা প্রভৃতির নেশা। এগুলো তুলে দেবাব চেষ্টা কবতে হবে। এ কাজের জন্যে মেয়েদেব এবং ছাত্রদেব খুব দরকার আছে। মেয়েরা এবং ছাত্রবা নেশাখোবদেব সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহাব ক'বে তাদের নেশার অভ্যাস দূব কববে। 'গড়ার কাজ যাবা করবে, তারা তো নেশা তুলে দেবাব চেষ্টা করবেই, তা ছাড়াও শাসন-পবিষদে যারা থাকবে, তাদেব তো আইন ক'বে এটা তুলে দেবাব জন্যে চেষ্টা কবতেই হবে।

(৪) **খাদি**—আগেই বলেছি, লোকেব হাতে ক্ষমতা ছড়িয়ে দেবার জন্যে খাদি বা খদ্দরেব কি দরকাব। লোকেব হাতে কি ভাবে ক্ষমতা ছড়িয়ে থাকবে, খাদি হচ্ছে তাবই একটা উদাহরণ। গান্ধীজী বলছেন, 'আমার কাছে খাদি ভারতবাসীর একতার চিহ্ন, ভাবতবর্ষের সকলের পয়সাব স্বাধীনতা এবং সমান অধিকাবেব চিহ্ন।' পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু খাদির পোশাককে বলেছেন, 'ভাবতেব স্বাধীনতাব রাজপোশাক।'

গ্রামে গ্রামে খাদি উৎপাদন করতে হবে। খাদি-উৎপাদন

মানে হচ্ছে—তুলোব চাষ করা, তুলো পরিষ্কাব কবা, পাঁজ তৈরী করা, সুতোকাটা, মাড় দেওয়া, রং করা, কাপড়বোনা ইত্যাদি।

খাদি-উৎপাদন সম্বন্ধে গান্ধীজী সাধারণ কয়েকটা নিয়ম বলেছেন ঃ—

(ক) যাদের বাড়িতে এতটুকুও জমি আছে, তাবা তুলোব চাষ কববে কিছু কিছু। এতে এই তুলো তৈবী কবাব কাজটা অন্তত ছড়িয়ে পড়বে অনেকেব হাতে।

(খ) সকলে তুলোব চাষ কববাব সুবিধা তো পায় না—তারা অপরেব কাছ থেকে কিনেই নেবে। তুলো পবিষ্কার কবা, ধুনাই কবা এবং পাঁজ করা খুবই সোজা—যতটা সম্ভব সকলে নিজেরাই এই কাজগুলো ক'বে নেবে। নিজেবা এ কাজগুলো কবা মানেও তো এ কাজগুলোকেও অনেকেব হাতে ছড়িয়ে দেওয়া। সুতো-কাটার জন্যে ধনুষ-তকলি ব্যবহাব কবা সব চেয়ে ভালো—প্রায চবকাব সমান সুতোই এতে কাটা যায়। খুব সহজেই এই তকলি তৈবী ক'বে নেওয়া যায়।

(গ) সুতো যা কাটা হোলো, সেটা তিন উপায়ে খবচ কবা যেতে পাবে। প্রথম, গবিবেব সাহায্যেব জন্যে 'নিখিল ভারত চরকা-সংঘ'কে দান ক'বে দেওয়া; দ্বিতীয়, নিজেব ব্যবহারেব জন্যে এই সুতো দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নেওয়া যেতে পারে; তৃতীয়, এই সুতোব বদলে যতটা পাওয়া যায় খাদি নেওয়া যায়।

(৫) গ্রামের অন্যান্য শিল্প—কাজ ছড়িয়ে দেবার জন্যে ছোট ছোট শিল্প গ'ড়ে তুলতে হবে গ্রামে গ্রামে, হাতে তৈরী আটা, ঢেঁকিছাঁটা চাউল, সাবান তৈরী, কাগজ তৈরী, দেশলাই তৈরী, চামড়া পাকানো, ঘানিতে তেল তৈরী করা, ঘি তৈরী করা—এগুলো ছোট ছোট শিল্প হিসাবে গ্রামে গ্রামে গ'ড়ে উঠা উচিত। গ্রামের লোকেরা গ্রামে-তৈরী জিনিসই কিনবে যথাসম্ভব।

(৬) গ্রাম-পরিষ্কার—যে সব গ্রামে আমরা থাকি, সেগুলো প্রায়ই অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকে। পুকুর, দিঘি, কুয়ো ইত্যাদি নোংরাতে ভর্তি হ'য়ে থাকে। এই সব গ্রামের রাস্তা-ঘাট পুকুর ইত্যাদি গ্রামের লোকেরাই পরিষ্কার ক'রে নেবে। এতে গ্রামে অসুখ-বিসুখ কম হবে, গ্রামের লোকের স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, গ্রামে বাস ক'রে সুখও পাওয়া যাবে।

(৭) বনিয়াদি শিক্ষা—আমাদের দেশে শিশুদের বা কমবয়সের ছেলেমেয়েদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার মধ্যে অনেক দোষ আছে ব'লে প্রায় ছেলেমেয়েদেরই পড়াশুনো ভালো লাগে না, যাতে ছোটদের কাছে পড়াশুনো ভালো লাগে, সেইভাবে শিক্ষা দিতে হবে। পড়ার বিষয়টা যতদূর সম্ভব সুন্দর ক'রে, সহজ ক'রে তাদের সামনে ধরতে হবে। দেশের যা কিছু বড়ো, যা কিছু ভালো, তাদের তা বলতে হবে—এর ভেতর দিয়েই ছেলেরা দেশকে ভালবাসতে

শিখবে। হাতেকলমে কাজ কবিয়ে আত্মনির্ভর হতে শেখানোও বনিয়াদি শিক্ষাব একটা প্রধান অঙ্গ।

(৮) বয়স্কদের শিক্ষা—আমাদের দেশে অধিকাংশ বয়স্কলোকেই লেখাপড়া জানে না—জ্ঞান তাদের অত্যন্ত কম। 'গড়াব কাজ' যারা কববে, বয়স্কদেব শিক্ষা দেওয়া এবং পড়ানো তাদের খুব বড় একটা কাজ। তাদেব শেখাতে হবে আমাদেব দেশ কত বড়, কত মহান্, কি বিরাট। তাদের জানাতে হবে, ভাবতবাসী একদিন সুখেই ছিলো, বিদেশীরা আমাদেব এ দেশ কেড়ে নিয়েছে,—কেড়ে নিয়েছে আমাদেব সুখ-শান্তি, ভাত-কাপড় সব। তাদেব শেখাতে হবে, তাদের স্বাধীনতা তাদেবই হাতে—তাবাই যেন এই স্বাধীনতাব জন্যে কাজ কবে।

(৯) মেয়েদের উন্নতি—আমাদেব দেশে মেয়েরা প্রায় সব বিষয়েই পেছিয়ে বয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতায় পুরুষের যতটুকু অধিকার, মেয়েদেবও ততটুকু আছে—কাবণ মেয়ে-পুরুষ দুইই নিয়ে তো দেশ। স্বাধীনতা সকলেব জন্যে, সকলকেই কাজ কবতে হবে তার জন্যে—মেয়েরা তা থেকে নিশ্চয়ই বাদ যাবে না। মেয়েদেব এই কথা বোঝাতে হবে; তাদের বলতে হবে, পুরুষেব সমান অধিকার যখন তাদের পেতে হবে, পুরুষেব মতন তখন খাটতেও হবে। মেয়েদেরও শিক্ষা দিতে হবে—অন্ধকাব হতে তাদের আলোতে নিয়ে আসতে হবে।

(১০) নিজের নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর—আমাদেব দেশে যত লোক মারা যায়, তাব অধিকাংশই মারা যায় বোগে। লোকে নিজেব স্বাস্থ্যেব দিকে নজর দেয় না বলেই অধিকাংশ বোগ হয়—বিশেষ ক'রে মেয়েদের বেলা তো এ কথাটা খাটেই। কেহ যদি সুস্থ না থাকে—গড়ার কাজ লোকে তা হ'লে কববে কি ক'বে ?

স্বাস্থ্য ও পবিচ্ছন্নতা সম্পর্কে গান্ধীজী কয়েকটা নিয়ম পালন করতে বলেছেন ঃ—(ক) ভালো চিন্তা করবে, অলসতা এবং খারাপ চিন্তা ত্যাগ করবে। (খ) বাত্রিদিন বিশুদ্ধ বাতাস সেবন করবার চেষ্টা করবে। (গ) সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে, সোজা হ'য়ে বসবে, এবং প্রত্যেক কাজকর্মে পবিচ্ছন্ন থাকবে। (ঘ) নিজে পবিচ্ছন্ন থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার আশেপাশের লোককেও পবিচ্ছন্ন রাখবে।

(১১) প্রদেশের ভাষা—যে প্রদেশেব যে ভাষা (যেমন বাংলাদেশে বাংলাভাষা), সেই প্রদেশের লোকেরা সেই ভাষা ভালো ক'বে শিখবে। আমাদের দেশে খুব কম শিক্ষিত লোকই তার নিজের ভাষায় কথা কইতে পারে—প্রায়ই তারা মাতৃভাষাব সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে! সমস্ত ব্যাপার তাদের প্রাদেশিক ভাষার ভেতর দিয়েই জানা উচিত—এতে সেই ভাষাটারও উন্নতি হয়, লোকের মধ্যে কোন বিষয় বোঝাবার বা প্রচাব করবারও সুবিধা হয়।

(১২) রাষ্ট্রভাষা—ভারতবর্ষের সব লোক যাতে সব লোকের সাথে কথা বলতে পারে, তার জন্যে একটা সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা দরকার। ভারতবর্ষে সব ভাষার মধ্যে হিন্দীভাষাতেই সব চেয়ে বেশী লোক কথা বলে, সুতরাং, হিন্দীভাষারই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। কংগ্রেসও এই কথা মেনে নিয়েছে। সকলে যদি রাষ্ট্রভাষা শেখে, ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে একতা আসার খুব সুবিধা হবে। প্রত্যেকের এই রাষ্ট্রভাষা শেখা উচিত। গড়ার কাজের কর্মীদের চেষ্টা করা উচিত যাতে সাধারণ লোক এই রাষ্ট্রভাষা শেখবার সুবিধা পায়।

(১৩) টাকাপয়সার সমতা—সত্যকার স্বাধীনতার জন্য সকলের টাকাপয়সা সমান হওয়ার বিশেষ দরকার। গড়ার কাজ যারা করবে, তাদের মধ্যে যদি কেউ ধনী থাকে, তারা সব টাকাপয়সা সাধারণের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনের অর্থই নিজের কাছে রাখবে। যত পারা যায় এর জন্যে প্রচার করতে হবে, বড়লোকদের যে ক'রে হোক (অবশ্য হিংসা দিয়ে কিছু লাভ হবে না) সকলের সাথে সমান ক'রে দেবার চেষ্টা করতে হবে। তাদের মন বদলে দেবার চেষ্টা করতে হবে।

(১৪) কিষান বা চাষী—ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় তিরিশ-বত্রিশ কোটিই হচ্ছে কিষান অর্থাৎ চাষী। অথচ এরাই জানে না তাদের হাতে কি

বিরাট শক্তি—এরাই জানে না, ভারতের স্বাধীনতা অর্থাৎ তাদের স্বাধীনতা আনবার জন্যে তা'রা কি বিরাট কাজ করতে পারে।

চাষীদের বড় বড় কথা, অহিংসা, রাজনীতি এসব আগে কিছু বলবার দরকার নেই। তাদের দিয়ে কাজ করাতে হয়। কাজটা সফল হলে তাদের বলতে হয়—কাজটাকে অমুক কাজ বলে, কাজটার এই এই গুণ, এই এই ভালো ফল ইত্যাদি। তবেই তারা জিনিসটা বুঝতে পাবে। তোমরা 'চম্পারণ সত্যাগ্রহ,' 'বারদোলী সত্যাগ্রহ,' এইসব বই পড়লে বুঝতে পারবে, মহাত্মা গান্ধী কি ভাবে এবং কোন পথে কৃষকদের মধ্যে কাজ করেছিলেন।

(১৫) শ্রমিক বা মজদুর—আমাদের দেশে যারা কলকারখানায় কাজ করে, তাদের নিয়ে শ্রমিকসংঘ (ইউনিয়ন) করতে হবে। এই সব সংঘে পাঠশালা কবার ব্যবস্থা করতে হবে শ্রমিকদের আর তাদের ছেলেপুলেদের জন্যে। তাদের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। তাদের দাবী এবং অধিকার নিয়ে কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। স্বাধীনতার জন্যে তাদেরও সব রকমে প্রস্তুত ক'রে তুলতে হবে।

(১৬) আদিবাসী—কোল, ভীল, গোণ্ড বা পাহাড়িয়া জাতি, এদের বলা হয় আদিবাসী। ভারতবর্ষে প্রায় দু'কোটি আদিবাসী আছে। এদের কথা আমাদের ভুললে চলবে কি

ক'রে ? এদেরও শিক্ষা দিয়ে, চেতনা দিয়ে, স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

(১৭) কুষ্ঠ ইত্যাদি মারাত্মক রোগ—ভারতের বহু লোক যক্ষ্মা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাচ্ছে—তাদের কাজ করার ক্ষমতা যাচ্ছে চ'লে। আমাদের দেশে এইসব সাংঘাতিক রোগে যারা পঙ্গু হ'য়ে আছে, তাদেরও তো রোগ সারিয়ে, ভালো ক'রে, আমাদের সঙ্গে নিতে হবে—তাদের জন্যেও তো আনতে হবে স্বাধীনতা। গঠনকর্মীদের তাই এদিকে মন দেওয়া দরকার।

(১৮) ছাত্র—ছাত্ররাই দেশের আশা। 'গড়ার কাজ' তারাই তো সবচেয়ে ভালো করতে পারে। তাদের মধ্যে থেকেই জাতির নেতা তৈরী হবে। গান্ধীজী ছাত্রদের সম্বন্ধে দুঃখ ক'রে বলেছেন, 'তারা অহিংসায় বিশ্বাস করতে চায় না। এক চড়ের বদলে দুটো চড় দিতেই তারা জানে।' কিন্তু এটা জানে না যে, যে-দোষের জন্যে একজনকে দুটো চড় মারতে হোলো, দুটো চড় খেলেও তার সেই দোষ যায় না, বরং হিংসা আরো বেড়ে যায়—ফল আরো খারাপ হয়।

ছাত্রদের তিনি কয়েকটা কাজ দিয়েছেন ঃ—

(ক) ছাত্রেরা কোনো দলাদলির ভেতর যাবে না।

(খ) রাজনৈতিক ধর্মঘটে তারা যোগ দেবে না। তাদের দাবী বা অধিকার নিয়ে তারা ধর্মঘট করতে পারে। যদি

তারা এক হ'য়ে, ভদ্র এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সত্যের জন্য ধর্মঘট করে, তবে তাদের জয় নিশ্চয়।

(গ) তারা সুতো কাটবে এবং সুতোকাটার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার কি সম্বন্ধ, সে সম্পর্কে পড়াশুনো করবে।

(ঘ) খদ্দর ব্যবহার করবে এবং যতটা পারা যায় কুটির-শিল্পের জিনিস ব্যবহার করবে।

(ঙ) জাতীয়পতাকা-আঁকা 'ব্যাজ' তারা পবতে পারে, কিন্তু কাউকে জোর ক'রে তা পরাবে না।

(চ) ছোটজাতকে বা অন্য ধর্মেব ছাত্রদের তারা ভাই ব'লে মনে করবে, হরিজন এবং অন্য ধর্মের ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে।

(ছ) হঠাৎ গ্রামের বা নিকটের কারও অসুখ করলে বা আঘাত লাগলে, তার প্রাথমিক চিকিৎসা এবং সেবা করবে। গ্রামের ময়লা পরিষ্কার করবে। গ্রামের শিশুদের এবং বয়স্কদের শিক্ষা দেবার জন্যে যতদূব পাবে চেষ্টা করবে।

(জ) রাষ্ট্রভাষা পড়তে ও লিখতে শিখবে।

(ঝ) নতুন কিছু জ্ঞানের বিষয় শিখলে সেটা তার নিজের ভাষায় লিখে গ্রামে গ্রামে সেই জ্ঞান সকলকে দেবে।

(ঞ) গোপনে কিছু করবে না—সব কাজ খোলাখুলি-ভাবে করবে। দাঙ্গাহাঙ্গামা হ'লে অহিংসভাবে সেটা থামাবার চেষ্টা করবে।

(ট) তাদের সমবয়সী ছাত্রীদের বোনের মত দেখবে। তাদের সঙ্গে ব্যবহারে যেন কোনো দোষ না থাকে।

সময় ঠিক রেখে চললে ছাত্ররা প্রচুর সময় বাঁচাতে পারে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে সেটুকু সময় তো তারা খাটতে পারে।

* * *

এই হোলো স্বরাজ বা সত্যিকারের স্বাধীনতা পাবার পথ। এই পথে কাজ ক'রে গেলে পুরুষ জাগবে, মেয়েরা জাগবে, শ্রমিক জাগবে, কৃষক জাগবে, আদিবাসী, ছেলেপুলে সবাই জাগবে—সবাই বুঝবে তাদের হাতেই স্বাধীনতা। সবাই তাদের স্বাধীনতাকে নিজেরাই নিয়ে আসবে।—ঘুমভাঙা কোটি কোটি লোককে কেউ দমন করতে পারবে না। এই 'গড়ার কাজ' হোলো মন দিয়ে গ্রহণ করবার জিনিস। মন দিয়ে যে এই কাজ আরম্ভ করবে, তার দেহটাকে হয়তো মেশিনগানের গুলিতে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তার মনের সত্যকে জয় করবার শক্তি আণবিক বোমারও নেই। স্বাধীনতার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু সে স্বাধীনতা কেউ এসে এক শুভ প্রভাতে আমাদের হাতে তুলে দেবে না। তার জন্যে খাটতে হবে সবাইকে—মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, দেহের সামর্থ্য আর শক্তি দিয়ে সবাইকে সে স্বাধীনতা রোজগার ক'রে নিতে হবে।

পঞ্চায়েত

খবরের কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন বেরোয় দেখেছো ?—'চা'ল মজুত রাখবেন না, চা'ল কম খরচ করুন, চা'ল কম খরচ করা—চা'ল তৈরী করারই সামিল।'

দেখে হাসি পায়। দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রাম, সেই সব গ্রামেই হয় এসব চা'ল। গ্রাম থেকে ধনী কারবারীরা এই-সব চা'ল নিয়ে এসে নিজেদের ভাণ্ডারে মজুত রেখেছে। যে জায়গায় তাদের খুশি হয়, যে জায়গায় তাদের স্বার্থ আছে, সেখানে তারা এই চা'ল কিছু কিছু ক'রে দেয়। যেসব গ্রাম এই চা'ল তৈরী করলো, সেখানকার লোকেরাই না খেয়ে মরে হাজারে হাজারে—লাখে লাখে। এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, দুঃখের ব্যাপার আর কিছু আছে! অথচ যেখানকার চা'ল সেইখানেই যদি রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তা হ'লে কি আর এতে মুশকিলে পড়তে হয় ?

শুধু কি চা'ল! অন্যান্য ব্যাপারেও সেই রকম। কতক-গুলো যন্ত্র আর কারখানা হ'য়ে দেশের লোকের কাজ কেড়ে নিয়েছে, স্বাস্থ্য কেড়ে নিয়েছে, পয়সা কেড়ে নিয়েছে। আমরা আমাদের প্রত্যেক কাজের জন্যে অপরের উপর নির্ভর করছি। অত্যন্ত অলস হ'য়ে পড়েছি আমরা, তাই এত বিপদ, তাই অপর লোক আমাদের পিঠে চেপে বসেছে। গান্ধীজী

বলেছেন, 'অলসতা ছাড়তে হবে। নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই ক'রে নিতে হবে। পরের উপর নির্ভর ক'রে তো প্রায় মরতে বসেছি, এখনও যদি হুঁশ না হয়, তবে মানুষ-জাতটাই যে যাবে লোপ পেয়ে।'

মানুষকে বাঁচতে হ'লে তার সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে। এই মিলেমিশে থাকাটা গান্ধীজীর মস্তবড়ো একটা কথা। এই মিলেমিশে থেকে আমাদেব ব্যবস্থা আমাদের ক'রে নিতে গেলেই দরকার হবে নিজেদের শাসনেব ব্যবস্থা নিজেরা করা। তার জন্যে দরকার 'পঞ্চায়েত'।

গ্রামের পাঁচজন লোক মিলে সেই গ্রামের সমস্ত ব্যবস্থা করা, গ্রামের অভাব-অসুবিধা মিটিয়ে দেওয়া হতো আমাদের দেশে অনেক আগে। তাকেই বলা হোতো পঞ্চায়েত। গ্রামের লোক গ্রামেই থাকতো, গ্রামের লোকদের জন্য যা দরকার, তা গ্রামের লোকেরাই তৈরী ক'রে নিতো, রাজা-রাজড়ার ধার তারা ধারতো না। এক দেশের রাজাকে হয়তো আর-এক দেশের রাজা যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে সে দেশ অধিকার করেছে, কিন্তু পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা কোনো অবস্থাতেই বদলায়নি। মাত্র দু'শো বছর আগে 'ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি' বিলাত থেকে এসে আমাদের দেশ অধিকার ক'রে এইসব পঞ্চায়েতগুলোকে তছনছ ক'রে দিলো।

এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা আবার ফিরিয়ে আনবার জন্যে গান্ধীজী বলেছেন সবাইকে। তবে এখন এক-একটা পঞ্চায়েত

গড়তে অনেক অসুবিধা হবে ব'লে তিনি বলেছেন, সাতটা গ্রাম মিলে এক-একটা পঞ্চায়েত করতে। এইসব গ্রামের প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকেরা (অর্থাৎ যাদের বয়স আঠারো বছর এবং তার বেশী হয়েছে) মিলে ভোট দিয়ে কয়েকজন লোক ঠিক করবে। ভোটে যাদের বেছে নেওয়া হোলো, তারাই পঞ্চায়েতের অধীন গ্রামগুলির সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা করবে।

জীবনধারণ করবার জন্যে সবচেয়ে দরকারী হচ্ছে খাওয়া আর পরা। পরার ব্যাপারটা পঞ্চায়েতের অধীনে থেকে গ্রামের লোকেরা নিজেরাই ঠিক ক'রে নেবে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, আমাদের দেশে জনপিছু বছরে ৩০ গজ কাপড় লাগে জামাকাপড় তৈরী করবার জন্যে। ভারতের এক-একটি গ্রামে গড়ে পাঁচশো ক'রে লোক থাকে। এর মধ্যে যদি পৌনে-চারশো লোক প্রতিদিন মাত্র একঘণ্টা ক'রে সুতো কাটে, তা হ'লে তাদের সমস্ত গ্রামের লোকের জন্যে দরকারী কাপড়ের সুতো তৈরী হ'য়ে যায়। এই যে খদ্দরের সুতো তৈরী হোলো, এ দিয়ে কাপড়বোনা খুব সহজ। এক-একটা গ্রামের জন্য মাত্র সাতজন তাঁতী যদি থাকে, তা হ'লে তারাই গ্রামের লোকের সব কাপড় বুনে দিতে পারে। প্রতি পঞ্চায়েতে যদি মাত্র ৩০ কি ৪০ জন তাঁতীও থাকে এবং প্রত্যেক সুস্থ লোক যদি দিনে মাত্র এক ঘণ্টা সুতো কাটে, তা হ'লে কোনো লোকের কাপড়ের ভাবনা কোনোদিন করতে হবে না। এতে শুধু গ্রামের লোকেরই

কাপড়ের ব্যবস্থা হবে না, শহরে যারা থাকে, তাদের কাপড়েরও ব্যবস্থা এর থেকে হ'য়ে যাবে।

পণ্ডিতেবা হিসেব ক'রে দেখেছেন, এইভাবে যদি পঞ্চায়েত তৈরী হয়, তা হ'লে প্রায় প্রত্যেক পঞ্চায়েতই তার নিজের জন্যে দরকারী খাবারটাও উৎপন্ন করতে পারবে। হয়ত ছু-একটা পঞ্চায়েত কোনো কারণে বেশী খাবাব তৈরী করতে পারবে না, তখন তারা অন্য পঞ্চায়েতে যেখানে বেশী খাবার আছে, সেখান থেকে কিনে নেবে। এইভাবে মিলেমিশে তো চলতেই হবে। এই মিলেমিশে চলার কথা গান্ধীজী বারবার বলেন। একেবারে সমস্ত পঞ্চায়েত নিজের খাবার নিজে তৈবী করতে পাবে কিনা সেই নিয়ে গবেষণা চলছে আমেরিকায়। এই গবেষণা প্রায় সফল হবার দিকে। এবং এই গবেষণা যদি সফল হয়, তবে তো আর কোনো ভাবনাই নেই—খাবারের জন্যে কারও কাছেই হাত পাততে হবে না কোনো পঞ্চায়েতকেই।

পঞ্চায়েতের আবও অন্যান্য কাজেব মধ্যে এইগুলি হোলো প্রধান ঃ—

(১) জমির কর বা 'ট্যাক্স' ঠিক ক'রে দেওয়া এবং সেটা আদায় ক'রে দেওয়া।

(২) চোর-ডাকাতের এবং আরো অন্যান্য উপদ্রব থেকে গ্রামকে বাঁচানো পুলিসের সাহায্য নিয়ে। গ্রামকে রক্ষা কবার ভার পঞ্চায়েতেরই নিতে হবে।

(৩) নিজেদের মধ্যে অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে যেসব ঝগড়া-বিবাদ হবে, পঞ্চায়েতকেই সেগুলো মিটিয়ে দিতে হবে। কারণ সকলকে মিলে মিশে থাকবার জন্যে তৈরী করা পঞ্চায়েতরই কাজ। আর তা ছাড়া এখনকার আদালতে যেসব বিচার হয় তাতে ঘুষের কারবার, মিথ্যাসাক্ষ্য এসব অত্যন্ত বেশী। এখনকাব আদালতের বিচার মানেই কোন্ পক্ষ কত মিথ্যা কথা ব'লে এবং কতো টাকা খরচ ক'রে নিজেদেব নির্দোষ প্রমাণ কবতে পাবে তারই চেষ্টা। কিন্তু নিজেবা নিজেদের বিচার কবলে ঘুষ, মিথ্যাসাক্ষী ওসব প্রায়ই চলতে পারে না। লোক এতে ক্রমেই ভালো হ'য়ে উঠে।

(৪) শিক্ষা দেবাব ব্যবস্থা প্রত্যেক পঞ্চায়েতকেই করতে হবে—কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদ (গভর্ণমেণ্ট) শিক্ষার ব্যাপারে হাত দেবে না। স্কুল, পাঠশালা ইত্যাদি পঞ্চায়েত থেকেই ক'রে দিতে হবে।

(৫) ওষুধপত্র দেবাব জন্যে ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করবে পঞ্চায়েত। হাসপাতাল আব সন্তান হবার জন্যে প্রসূতিশালা এবং এইসবের জন্যে চিকিৎসক আব সেবকের (নার্স) ব্যবস্থাও পঞ্চায়েতই কববে।

(৬) গ্রামেব স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা পঞ্চায়েতকেই করতে হবে। গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, জঙ্গল-কাটাব ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে।

(৭) গ্রামের ঘরবাড়ি, পুকুর-দিঘি, কুয়ো এই সব ভালোভাবে রাখবার ব্যবস্থা পঞ্চায়েত করবে।

(৮) গ্রামের খাবারটা গ্রামেই তৈরী করার ব্যবস্থা পঞ্চায়েত করবে। চাষীদেব অভাব-অভিযোগ, সুবিধা-অসুবিধা, বা কি করলে আরো বেশী ফসল পাওয়া যায়, এসবের ব্যবস্থা পঞ্চায়েতকে করতে হবে।

(৯) গ্রামেব লোকদেব দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কবাবাব ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের হাতে থাকবে।

(১০) যা থেকে জিনিস তৈরী হয়, তাকে বলা হয় 'কাঁচামাল'। এই 'কাঁচামাল' গ্রামে যা হবে, তা থেকে নিজেদের দবকাব সেবে নেবার পর, সেগুলো বাইবে বেচবার ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁচামাল থেকে গ্রামে যেসব জিনিস তৈরী হবে. সেগুলো বাইবে বিক্রি কবাব ব্যবস্থাও পঞ্চায়েত কববে।

পঞ্চায়েতের মোটামুটি এই কাজগুলো সম্বন্ধে পরিকল্পনা করেছেন গান্ধীজী, তা ছাড়া কখন কি করতে হয় গ্রামের ভালোর জন্যে এবং উপকাবের জন্যে, গ্রামের লোককে সুখী রাখবার জন্যে, তার প্রতিও পঞ্চায়েত দেখবে বৈকি। এগুলোর কথা জানিয়েছি পরে।

মানুষের সত্যিকার স্বাধীনতাকে এবং মানুষ-জাতকে বাঁচিয়ে রাখতে এই পঞ্চায়েতের অত্যন্ত দরকার। প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত হবে যেন এক-একটা আলাদা আলাদা রাষ্ট্র।

কাজ চালাবার সুবিধার জন্যে কয়েকজন লোককে ভোটে বেছে নেওয়া হবে সত্যি, কিন্তু আসলে পঞ্চায়েত চালাবে পঞ্চায়েতের অধীন যেসব গ্রাম থাকবে তার লোকেরাই— কারণ সব লোককে অগ্রাহ্য ক'রে তো আর মাত্র কয়েকজন লোক যা-খুশি ক'রে যেতে পারে না। আলাদা আলাদা থেকেও একটি বিরাট রাষ্ট্রের অধীনে সব পঞ্চায়েতকে থাকতে হবে ব'লে, তারা মিলেমিশে থাকবে।

শিল্প থাকবে বৈকি সে অবস্থায়। শিল্প না হ'লে মানুষ থাকতে পারে? কিন্তু সে শিল্প রাষ্ট্রের অধীনে বড় বড় কারখানা না হ'য়ে পঞ্চায়েতের অধীনে ছোট ছোট কুটিরশিল্প হয়ে থাকবে। প্রত্যেকে তাতে ছোট ছোট শিল্পের কাজ ক'রে তাদের দরকারী জিনিস তৈরী ক'রে নেবে। আরো অন্যান্য শিল্প, যা মানুষকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখবে, সেগুলিও দরকার হ'লে তৈরী করতে হবে। কিন্তু সব সময় মনে রাখতে হবে ঐ কথাটা—সেই যন্ত্র যেন সকলের জন্যে তৈরী হয়। অনেকের কাজ কমিয়ে কয়েকজনেব লাভ বাড়ানোর জন্যে যেন সেই যন্ত্র তৈরী না হয়।

গ্রামে গিয়ে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মধ্যে থাকার আরও একটা উপকার আছে। বৈজ্ঞানিক ম্যাল্‌থাস্‌ হিসাবে দেখিয়েছেন, পৃথিবীতে ক্রমশ মানুষ ক'মে যাচ্ছে। অর্থনীতির মস্তবড়ো পণ্ডিত অ্যাডাম স্মিথ এর কাবণ দেখাতে গিয়ে বলেছেন, শহরে সন্তান যে পরিমাণে জন্মায়, তার তুলনায়

গ্রামে জন্মায় বেশী। বিজ্ঞানী হগ্‌বেনও বলেছেন, শহরে এই যে জন্মের সংখ্যা কম হয়, শহরে নকল যন্ত্র-সভ্যতাই এর কারণ। আজকালকার বৈজ্ঞানিকরাও এঁদের কথা মেনে নিয়েছেন, এবং সকলকেই উপদেশ দিচ্ছেন গ্রামে ফিরে গিয়ে বাস করতে, শহরের মেকি সভ্যতায় না ভুলতে—মানুষ-জাতটাই যে ক্রমে ক্রমে তা হ'লে ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

দুনিয়ার শান্তি বজায় রাখবার জন্যেও এই পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার দরকার আছে। এর আগেই বুঝেছো, যন্ত্রের দ্বারা বেশী মাল তৈরী ক'রে সেগুলো অন্য দেশে বেচবার জন্যে প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করে, এব থেকেই দেশে দেশে প্রতিযোগিতা সুরু হয়, আর তা থেকেই লাগে যুদ্ধ। কিন্তু পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় বেশী মাল তৈরীব নেশাও থাকবে না, কোন দেশেরই প্রতিযোগিতা কবতে হবে না কারও সঙ্গে। যুদ্ধ হওয়ার ভয়ও তা হ'লে ক'মে যাবে।

আর একটা কথা। কুটিবশিল্পে অথবা মানুষকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখবার জন্যে যে যন্ত্র দবকাব হবে, সেগুলি তৈরী করাব জন্যে হয়তো বড় কারখানার দরকাব হতে পারে। কিন্তু বড় যন্ত্রের কারখানার কথা শুনতেও কেমন যেন ভয় হয়। ইচ্ছা হ'লে সেই যন্ত্রগুলোব এক-একটা অংশ আলাদা আলাদা ভাবে তৈরী কবার ব্যবস্থা ক'রে সেই কারখানাকেও ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। ফরাসীদেশের হায়াসাঁথ ড্যুবরয়েল নামে একজন অর্থনীতির পণ্ডিত বলেছেন, 'প্রকাণ্ড শিল্পও

এমনভাবে গড়া যেতে পারে, যা'র প্রত্যেকটি অংশ স্বাধীন থাকবে।' এইরকম ভাবে ছড়িয়ে থাকায় কোনো কিছু ক্ষতি হবে না, এও তিনি বলেছেন।

সমস্ত দেশটা যদি এইভাবে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে থাকে, তবে বিদেশীর আক্রমণের হাত থেকেও দেশকে বাঁচাবাব যথেষ্ট সুবিধা হয়। একটা গ্রামের সমস্ত বাড়ির টাকাকড়ি যদি কেবল একটা বাড়িতে জমা থাকে, তবে সেই বাড়িতে ডাকাতি করেই সমস্ত গ্রামটাকে কাবু করা যাবে। আজকের দিনে পৃথিবীর যে-কোন দেশের রাজধানী অধিকাব করলেই সেই দেশটাকে অধীনে আনা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষমতা আর টাকা যদি এক লক্ষ পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে থাকে, তবে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত হবে এক-একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র। ভারতবর্ষ অধিকাব কববার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেই এক লক্ষ পঞ্চায়েত দখল করতে হবে। এবং এই এক লক্ষ পঞ্চায়েতকে আলাদাভাবে দখল ক'রে ভারতবর্ষ অধিকার করা যে-কোন জাতির পক্ষে অসম্ভব। পঞ্চায়েতে ভাগ হ'য়ে থাকবার এটাও একটা মস্তবড় যুক্তি।

এতক্ষণ ধ'রে প্রমাণ করবার চেষ্টা করলাম এবং তোমরাও আশা করি এবার বুঝেছো, অর্থ এবং ক্ষমতা ছড়িয়ে দেবাব জন্যে গান্ধীজী যে এই পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার কথা বলেছেন, এটা তাঁর পাগলামি নয়, বরং এইটেই হচ্ছে সব মানুষকে সমান অধিকার দেবার জন্যে, সমান স্বাধীনতা দেবার জন্যে,

অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবার জন্যে একমাত্র সরল রাস্তা। সব মানুষকে সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা মাত্র কয়েকজন ক্ষমতাওয়ালা লোক দিতে পারবে না, প্রচুর ক্ষমতা হাতে পেলে তাদের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভবও নয়, সুতবাং সব মানুষের স্বাধীনতার জন্যে সব মানুষকেই খাটতে হবে—যেভাবে তাদের থাকতে হবে, তার জন্যে তৈরী হতে হবে গোড়া থেকেই। গান্ধীজীর 'আঠারো দফা গড়ার কাজের' ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে সেই তৈরী হবার রাস্তা।

স্বাধীন ভারতের জন্য গান্ধীজীর পরিকল্পনা

ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে ছিলো—সেই ঘুম তাব ভেঙেছে। তাই আর সে বিদেশীর শাসন মানতে চায় নি—সে চেয়েছে নিজের হাতে নিজেব শাসনভার। এই দাবীব ঢেউএ 'সাবা ভারত উথল্' গেছে। আইন-অমান্য আন্দোলন, 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, সবই এই স্বাধীনতার দাবীর বন্যা। সকলেই বলেছে 'স্বাধীনতা চাই'—যে স্বাধীনতাব মানে বোঝে সেও বলেছে, যে না বোঝে সেও।

স্বাধীনতাব প্রথম কথা হচ্ছে জাতীয় সরকার বা শাসনতন্ত্র, যেটা চালাবে সাধারণ লোকেরই বেছে দেওয়া লোক। কিন্তু সাধারণ লোক কি ভাবে থাকবে, তাদের জন্যে কি করা হবে সেটা আজকের অনেক সাধারণ লোকই জানে না। গান্ধীজী এবং ভাবতের মস্তবড় একজন অর্থ-নীতির পণ্ডিত—অধ্যক্ষ নাবায়ণ আগরওয়াল এ সম্বন্ধে এক পরিকল্পনা কবেছেন। সাধারণ লোককে উন্নত ক'রে তোলাব জন্যে এই পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে দশ বৎসরের মধ্যেই সফল ক'রে তুলবে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট। অধ্যক্ষ আগরওয়াল এ সম্পর্কে 'গান্ধী-পরিকল্পনা' নামে একখানা

বই লিখেছেন। তোমরা বইটা পড়বার চেষ্টা কোরো। তোমাদের জানবার সুবিধার জন্যে পরিকল্পনাটি মোটামুটি নীচে জানালাম :—

নেহাৎ দরকারী জিনিস

সাধারণ লোকের জন্যে এইগুলিই হোলো নেহাৎ দরকারী জিনিস—(১) স্বাস্থ্যকর খাদ্য (২) দরকারী কাপড়চোপড় এবং পোশাক (৩) প্রত্যেকের থাকবার জন্যে অন্তত ছ'-সাত হাত লম্বা এবং ছ'-সাত হাত চওড়া জায়গা (৪) শিশুদের এবং বয়স্কদের প্রত্যেকের জন্যে পড়াশুনোর ব্যবস্থা (৫) চিকিৎসার সুবিধা (৬) পোস্ট-আফিস ইত্যাদি (৭) আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা।

চাষ

চাষ হচ্ছে ভারতবর্ষের মস্ত একটা জিনিস। চাষের সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন :—

(ক) চাষের উদ্দেশ্য হবে সকলের জন্যে পুষ্টিকর খাবার তৈরী করা।

(খ) সব দেশে সব রকমের ফসল হয় না। যে দেশে যে ফসল ভালো হয়, সেই দেশে তা করতে হবে।

(গ) যতদূর পারা যায়, দেশের জন্যে দরকারী খাদ্যশস্য

এবং শিল্পের জন্যে কাঁচামাল দেশেই উৎপন্ন করতে হবে। আর দেশের দরকার সেরে যদি কিছু মাল থাকে, তবে তা অন্য জায়গায় বেচা যেতে পারে।

(ঘ) যে প্রদেশে যতটা খাদ্য দরকার সেটা সেই প্রদেশেই তৈরী করবার খুব চেষ্টা করতে হবে।

(ঙ) দূরের বাজারে মাল বেচে টাকা লাভ করা বন্ধ করতে হবে।

(চ) চাষের যাতে উন্নতি হয়, সে সম্পর্কে ভাববার জন্যে রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

জমি ঃ—জমিতে এখনকার মত জমিদারী কেউ করবে না। সব জমি হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। পঞ্চায়েত সকলকে জমি ভাগ ক'রে দেবে। জমির খাজনা ঠিক করে দেবে পঞ্চায়েতই।

জমির উদ্ধার ও রক্ষা ঃ—হিসাবে দেখা গেছে, আমাদের দেশে প্রায় ৬৫ কোটি বিঘা জমি খালি প'ড়ে আছে—কোন চাষ তাতে করা হয় না। এইসব জমি চাষের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। জমি যাতে নদীতে ভেঙে গিয়ে নষ্ট না হয়, তারও ব্যবস্থা করা হবে।

চাষী যাতে ভালো বীজ পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, ভালো বীজ না হ'লে ফসল ভালো হয় না। আর, যে সব যন্ত্র চাষের কাজে লাগে, সেগুলোকে ভালোভাবে তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

পশু-পালন

আমাদেব দেশে প্রায় ৩৮ কোটি গৃহপালিত পশু। গরু আর মহিষ আছে প্রায় পাঁচ কোটি। কিন্তু তাদের অবস্থা বড় কাহিল। তাদের খাওয়াবাব জন্যে ভালো ঘাসওয়ালা মাঠ তৈরী করতে হবে। তাদের দুধ থেকে নানা রকম জিনিস তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে। মবা পশুব চামড়াকে এবং হাড়কে কাজে লাগাতে হবে। তাদের দিয়ে এইভাবে পয়সা এলে তাদের প্রতি যত্ন নেবাব ঝোঁকও আসবে। পশু মারা গেলে তার চামড়া, হাড়, লোম, দাঁত, খুর, চর্বি ইত্যাদি দিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবকম জিনিস তৈবী করাব ব্যবস্থা পঞ্চায়েত কববে।

ফল ও সব্জির চাষ

ফলের চাষ ভারতবর্ষে যতটা হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক কম হয়। ফলের চাষ বাড়াতে হবে। কৃষকেরা যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলেব চাষ কবে, তা হ'লে তাজা ফল তো পাওয়া যাবেই প্রচুর, তা ছাড়া এতে অনেকের পয়সাও আসবে।

শাক-সব্জির উপকাবিতা সম্বন্ধে ব'লে শেষ করা যায় না। স্বাস্থ্য ভালো করার যথেষ্ট জিনিস রয়েছে এর ভিতর। শাক-সব্জির চাষ ও তার উন্নতির ব্যবস্থা কববে পঞ্চায়েত।

বনজ-শিল্প

ভারতবর্ষে ৩০ কোটি বিঘা বন। এই সমস্ত বন থেকে কি ভাবে অর্থ আয় করা যায়, সে সম্বন্ধে রাষ্ট্র দেখবে।

কুটিরশিল্প

খাদি ঃ—এর সম্বন্ধে আগেই বলেছি। সকলেই তার নিজের প্রয়োজনে স্নুতো কাটবে এবং খদ্দব পববে। গান্ধীজী বলেছেন,—'গাঁয়ের লোকে যেমন নিজের খাবার নিজেরাই রান্না করে, তেমনি নিজের প্রয়োজনমত খদ্দর তাদের নিজেদেরই তৈবী করতে হবে।'

কাগজ-তৈরী ঃ—কাগজ তো কত দরকারী জিনিস, তা তোমরা নিজেরাই বোঝো। এই কাগজ তৈরী করা খুবই সহজ—বাড়ির মেয়েরা এবং ছেলেপুলেরাও করতে পারে। সামান্য জিনিস, যেমন ফেলে-দেওয়া তুলো, ছেঁড়া কাগজ, ঘাস ইত্যাদি থেকেই কাগজ তৈরী কবতে পারা যায়।

তেল-তৈরী ঃ—ঘানি দিয়ে তেল বের করার কাজ গ্রামের লোকেরাই করতে পাবে। এই তেল কলের তেলেব চেয়ে অনেক খাঁটি, পুষ্টিকব এবং খেতে ভালো। অধ্যক্ষ আগরওয়াল বলছেন, 'যদিও কলের তেল ঘানির তেলেব চেয়ে সস্তা, তবু ঘানির তেলই ব্যবহাব করা উচিত। কলের তেল ব্যবহার করলে টাকাটা যায় বড়লোকদের পকেটে।

ঘানিব তেল ব্যবহারে বহু গ্রামবাসীর খাবাব ব্যবস্থাটা হ'য়ে যায়।'

তিসিব তেলে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এটা যদি চালানো যায়, তা হ'লে কেবোসিন কেনবাবও দবকাব ক'মে যাবে।

ধান-ভানা ঃ—কলেব চা'ল ঢেঁকিছাঁটা চা'লেব চেয়ে অনেক কম পুষ্টিকর। কলেব চা'লের চেয়ে ঢেঁকিছাঁটা চা'ল অনেক বেশী স্বাস্থ্যকব। কলে চা'ল খুব পালিশ কবা হয় ব'লেই তাব স্বাস্থ্যকর জিনিসটা নষ্ট হ'য়ে যায়। গ্রামে গ্রামে ঢেঁকিছাঁটা চা'লেব ব্যবস্থা কবতে হবে প্রচুব পরিমাণে।

অন্য কুটিরশিল্প ঃ—পঞ্চায়েতেব ভেতব আখ, খেজুর ও তালের বস থেকে গুড় তৈবী, মৌমাছির চাক থেকে মধু সংগ্রহ, সাবান তৈরী, গম ভাঙা, হাঁস-মুবগী পালন, কাঠেব কাজ, কামাবেব কাজ, মাটির জিনিস তৈবী, খেলনা তৈরী, টালি ও ইট তৈবী, কাচের বাসন তৈবী ইত্যাদি কুটিরশিল্পের কাজগুলো কম পরিশ্রমেই কবা যেতে পারে। এতে গ্রামও উপকার পাবে, যাবা কাজ করবে তারা তো খাবাব পয়সা জোগাড় করতে পারবেই।

কুটিরশিল্পের কাজ শুধু যে এইগুলোই করতে হবে, তাব কোনো মানে নেই। লোকেব ভালোর জন্যে এবং সুবিধাব জন্যে রাষ্ট্র ও পঞ্চায়েত আরো অন্যান্য ছোট ছোট কুটিরশিল্পের ব্যবস্থাও কবতে পারে।

রাষ্ট্রের সাহায্য

কুটিরশিল্প যাতে বেশী ক'রে ছড়িয়ে পড়তে পারে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে, তার জন্যে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে হবে। গ্রামে যারা ঐসব কাজ করবে, তাদের কি ভাবে সাহায্য করা হবে সে কথা গান্ধীজী বলেছেন ঃ—

(১) ধার দেওয়ার জন্যে সমিতি করা হবে। তারা লোকের সুবিধার দিকে চেয়ে ধার দেবে।

(২) কি ভাবে পয়সা রোজগার করা যায়, তার শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে শিশুদের আর বয়স্কদের বিদ্যালয়ে।

(৩) কুটিরশিল্পের জন্যে ভালো যন্ত্র তৈরী ও কুটিরশিল্প বাড়ানোর জন্যে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ব্যবস্থা করা।

(৪) গ্রামে যে সব কাঁচামাল (যা থেকে জিনিস তৈরী করা হয়) উৎপন্ন হয় না, সেগুলো কয়েকজন মিলে কেনার ব্যবস্থা।

(৫) গ্রামের দরকার সারা হ'লে বাড়তি মাল বিক্রির ব্যবস্থা।

(৬) বড় বড় কারখানা যেন কুটিরশিল্পগুলিকে নষ্ট না ক'রে দেয়, তা দেখা।

(৭) হাতে তৈরী মালের জন্যে রেল ও স্টিমারে কম ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(৮) দরকার হ'লে মিলের ওপর কর বসিয়ে কুটির-শিল্পকে সাহায্য করা।

মৌলিক শিল্প

এমন কতগুলো শিল্প কবতে হবে, যেগুলোর জন্যে বড় কারখানা দরকার হবে। এই শিল্পগুলো হয়ে কুটিরশিল্পকে সাহায্যই করবে। এই বড় শিল্পগুলি থাকবে রাষ্ট্রের অধীন। সেগুলি হচ্ছে ঃ—

(১) বিদেশীব আক্রমণের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবাব জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও দরকারী জিনিস তৈবী।

(২) বিদ্যুৎ-উৎপাদন।

(৩) খনি, ধাতু এবং বনেব গাছগাছড়া দিয়ে নানা বকম জিনিস তৈরী।

(৪) বড় ও ছোট যন্ত্র তৈরী করা।

(৫) জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটবগাড়ি আর উড়োজাহাজ তৈরী।

(৬) রাসায়নিক জিনিস যেমন অ্যাসিড ইত্যাদি, চাষেব উন্নতিব জন্য সাব এবং ওষুধ তৈরী।

পরিবর্তনের সময়টুকু

আমরা আজ স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা সে নয়। এ স্বাধীনতা পাবার পবও গান্ধীজী বলেছেন—স্বাধীনতা অনেক দূবে। যেদিন দেশেব প্রতিটি লোক স্বচ্ছন্দে খেতে পবতে থাকতে পাবে, সেদিনই আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা।

কিন্তু চট্ ক'রে তো আর সত্যিকারের পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না—ক্রমে ক্রমে হবে অবস্থার পরিবর্তন। পরিবর্তনের সময়টুকুতে এই কাজগুলো করতে হবে ঃ—

(ক) বড়লোকদের যে-সব কারখানা আছে, রাষ্ট্র সেগুলো কিনে নেবে। এক সঙ্গে যদি কিনতে না-ও পারে, তবে যতদিন এইরকম কারখানা থাকবে, রাষ্ট্রের কঠিন শাসনে থাকতে হবে সেগুলোকে। জিনিসের দাম ঠিক করা, লাভ, মজুরের অবস্থা এবং কুটিরশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে এই কারখানাগুলোকে রাষ্ট্রের কথা মেনেই চলতে হবে।

(খ) এইরকম কারখানা বাড়তে দেওয়া হবে না।

(গ) বিদেশী কারখানা বা ব্যবসা সব রাষ্ট্র নিয়ে নেবে। ভারতবাসীরা যেগুলো চালায়, কেবল সেগুলোই থাকবে।

(ঘ) বোনা, তেল, চিনি, কাগজ, চা'ল ইত্যাদির কারখানা রাষ্ট্রের কথা মেনে চলবে। কুটিরশিল্প থেকে যতদিন না এই-সব জিনিস তৈরী করা যায়, শুধু ততদিনই এইসব কারখানা চলবে।

সাধারণ লোকের প্রয়োজন

জাতীয় সরকার লোকের দরকার মেটাবার জন্যে নীচের ব্যবস্থাগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখবে ঃ—

(১) যানবাহন ও যোগাযোগ ঃ—এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়া-আসা করাতে লোকের যাতে

অসুবিধা না হয়, তার জন্যে বেলপথ আবও অনেক বাড়াতে হবে এবং সেগুলোকে বক্ষা করার সুব্যবস্থা করতে হবে। জলপথে যাতায়াতেব সুবিধা করতে হবে। বিমানপোত বাড়াতে হবে। লোকেব সুবিধাব জন্য পোস্টাফিস, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন বাড়িয়ে ফেলতে হবে।

(২) **সাধারণ স্বাস্থ্য**ঃ—অসুখ যাতে না হয়, তার ব্যবস্থা এবং অসুখ হ'লে সাবাবাব ব্যবস্থা কবতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে খেলাধূলাব বন্দোবস্ত করতে হবে। হাসপাতাল, ডাক্তাব, নার্স, ওষুধ, এগুলোব প্রচুব ব্যবস্থা খুব দবকাব।

(৩) **শিক্ষা**ঃ—সকলে যাতে শিক্ষা পায় তাব ব্যবস্থা কবতে হবে। শিশুদের পড়াশুনা শেখানোব ব্যবস্থা করতে হবে। তাবপব বালকদের শিক্ষা দিতে হবে—শুধু বই পড়িয়ে নয়, হাতে কলমে নানা কাজ শিখিয়ে, তাদেব দেশ সম্বন্ধে এবং দুনিয়া সম্বন্ধে শিখিয়ে। এব নাম তালিমী শিক্ষা—এটা সাত বছব ধ'বে চলবে। এব চেয়ে বড়দেব দিতে হবে মাধ্যমিক শিক্ষা। তালিনীতে যা শিখলো, তা থেকে কি ভাবে ভালো ক'বে বেঁচে থাকা যায়, কি ভাবে পয়সা আয় কবা যায় তাব শিক্ষা, এবং আব একটু উঁচু ধবনেব শিক্ষার ব্যবস্থা হোলে মাধ্যমিক শিক্ষা। তাবপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। বড় জিনিস-গুলো পড়াবাব বন্দোবস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কববে। রাষ্ট্রেব অধীনে সাধাবণ লোকেব মধ্যে যাবা কাজ কববে—যেমন ডাক্তাব,

নার্স, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শিখিয়ে তৈরী করা হবে। বয়স্কদের শিক্ষার কথা তারপর। বয়স্কদের এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা ভদ্র এবং রুচিশীল হ'য়ে ওঠে, যাতে তারা দেশকে চিনতে পাবে, তাদেব অবস্থাব উন্নতি করতে পারে।

(৪) ব্যাঙ্ক ও বীমা ঃ—ব্যাঙ্ক আব বীমা রাষ্ট্রের অধীনে থেকে যাতে সত্যই লোকেব উপকাবে আসতে পারে, তা দেখতে হবে।

(৫) হিসাব ও গবেষণা ঃ—দেশ কি ভাবে চলছে, যতটুকু করতে বলা হয়েছে, তাব কতটুকু হোলো সে সম্বন্ধে হিসাব বাখা দরকাব। দেশকে ক্রমশ উন্নত করতে হলে, এই হিসাবের খুব দরকাব। প্রত্যেক জায়গায় এই সব হিসাবের কাজ জানে এমন লোক বাখতে হবে। এই সব গবেষণাব কথা জানলে সাধারণ লোকও বুঝতে পারবে, তাদের অবস্থা কখন কি রকম বয়েছে। এই যে হিসাব বাখবার গবেষণালয়, এগুলি থাকবে জাতীয় সবকারেব অধীনে।

ব্যবসা ও বণ্টন

পঞ্চায়েতেব লোকেদের দবকাবী জিনিসপত্রেব জন্যে যা কাঁচামাল দরকাব, সেগুলো গ্রামেই উৎপাদন করতে হবে। শুধু যেটা না পাওয়া যায়, সেটাই বাইবে থেকে আনতে হবে। এখনকাব দিনে লোকে কাঁচামাল উৎপাদন করে খালি টাকা

লাভ করার জন্যে, আর তখন পঞ্চায়েত কাঁচামাল উৎপাদন করবে পঞ্চায়েতের লোকের সুখের জন্যে। কার কি রকম দরকার, সেটা ঠিক ক'রে, তাকে সেই রকম জিনিসপত্র দেবার ভারও পঞ্চায়েতের।

শহর

(ক) শহরের সংখ্যা ক্রমে কমিয়ে ফেলতে হবে।

(খ) যে সব শহর রয়েছে সেগুলোর স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা, ব্যবসা ও শিল্পের প্রতি দৃষ্টি রেখে সেগুলোকে উন্নত করতে হবে।

(গ) বড় বড় শিল্পগুলোকে শহরের ভেতর ভিড় ক'রে থাকতে দেওয়া হবে না। সরিয়ে সেগুলোকে আশে-পাশের গ্রামে নিয়ে যেতে হবে।

(ঘ) গ্রামে যে সব জিনিস তৈরী করা যায় সেগুলো শহরে তৈরী করতে দেওয়া হবে না।

(ঙ) এখন গ্রামগুলো নির্ভর করছে শহরের উপর কিন্তু তখন শহরগুলো নির্ভর করবে গ্রামের উপর।

অন্য জাতির সঙ্গে বাণিজ্য

অপর জাতের কাছ থেকে টাকা লুঠ ক'রে দেশকে বড়-লোক করবার জন্যে ব্যবসা করা চলবে না। যে জিনিস ভারতবর্ষে চেষ্টা করলে উৎপাদন করা যায়, সেটা ভারতবর্ষেই

করতে হবে। এমন জিনিস যা কেবল ভারতবর্ষেই বেশী জন্মে, অন্য দেশে জন্মে না, সে জিনিস অন্য দেশকে দেবো না কেন? যে জিনিস অনায়াসে দেশে তৈরী হতে পারে, এবং তৈরী করার দরুন অনেক লোককে কাজ দেওয়া যায়, সে জিনিস কিছুতেই বিদেশ থেকে আনা হবে না। দেখতে হবে, অপব জাত যেন আমাদের দেশ থেকে ব্যবসা দিয়ে টাকা না লুঠতে পারে, আমরাও অপর দেশ থেকে টাকা লুঠ ক'রে আনবো না। বাইরের জাতগুলোর সঙ্গে ব্যবসা করবার ভার থাকবে রাষ্ট্রের—ব্যক্তিগতভাবে কোনো ব্যবসায়ীর নয়।

শ্রমিক

শ্রমিকদের সুবিধাব জন্যে এইগুলিব প্রতি দৃষ্টি বাখা হবে :—

(১) যথেষ্ট পবিমাণ মজুরী।

(২) স্বাস্থ্যকব জায়গায় কাজ করানোব ব্যবস্থা।

(৩) কাজেব নির্দিষ্ট সময় ঠিক ক'বে দিতে হবে।

(৪) মালিক আর শ্রমিকদের ঝগড়া মেটাবাব ব্যবস্থা।

(৫) বুড়োবয়সে, বোগে, দুর্ঘটনায় এবং কাজ যখন করতে অক্ষম হবে, তখন তাদেব বক্ষার ব্যবস্থা কবা।

(৬) অত্যাচার থেকে শ্রমিককে রক্ষা করা।

(৭) মেয়ে-শ্রমিকদের রক্ষার ব্যবস্থা। সন্তান হবাব সময় তাদের জন্যে যথেষ্ট পবিমাণ ছুটির ব্যবস্থা করা।

(৮) স্কুলে যাবাব মতো যেসব ছেলেমেয়ের বয়স, তাদের শ্রমিকের কাজে নেওয়া হবে না।

(৯) নিজেদেব মধ্যে সংঘ গ'ড়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা কববার অধিকাব শ্রমিক ও কৃষকদের দেওয়া হবে।

কর বা ট্যাক্স

(১) গবিবদেব উপব বেশী কব চাপানো হবে না।

(২) বেশী আয়েব উপব কব চাপানো হবে বেশী ক'বে।

(৩) নুনেব উপর থেকে কব তুলে দিতে হবে।

(৪) মদ, আফিং, গাঁজা ইত্যাদি বেচে টাকা আয় করা একেবাবে বন্ধ ক'বে দিতে হবে।

(৫) চাষেব উপব বিচাব ক'বে কব চাপাতে হবে।

(৬) নেহাৎ দবকাবী সম্পত্তি ছাড়া আর সব সম্পত্তির উপব কব চাপাতে হবে।

(৭) চাষীদেব খাজনা কমাতে হবে।

(৮) টাকাব বদলে জিনিস দিয়ে কব দেওযাব নিয়ম চালানোর চেষ্টা কবতে হবে।

(৯) সৈন্য-বিভাগের অনাবশ্যক বাড়তি খবচাগুলো কমিয়ে, তাব খবচ অর্ধেক কবতে হবে।

(১০) স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গবেষণা এবং লোকের ভালোর জন্যে যেসব প্রতিষ্ঠান, তাদেব খরচ বাড়াতে হবে।

(১১) সবচেয়ে বেশী মাইনে পাঁচশো টাকার বেশী হবে না।

আয় আর খরচ

হিসাব ক'রে দেখা গেছে, এই পবিকল্পনা কাজে লাগাতে গেলে প্রায় ৩৫০০ কোটি টাকা খরচ লাগবে। হিসাব ক'বে এও দেখা গেছে, এইসব খবচেব জন্যে ৩৫০০ কোটি টাকার বেশী দেশ থেকে আয় কবা যাবে অতি সহজে। এ বিষয়ে তোমরা ভালোভাবে জানতে পাববে 'গান্ধী-পবিকল্পনা' বইখানা পড়লে।

* * *

এই হোলো স্বাধীন ভাবতবর্ষেব জন্যে গান্ধীজীব মোটামুটি পরিকল্পনা। যাবা কলকাতার মতো শহরে থাকে ফ্যানেব হাওয়ার তলায় টাকাব গদিতে শুয়ে, তাদেব কাছে হয়তো পরিকল্পনাটি খুব ভালো লাগবে না। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, কোটি কোটি মজুব, চাষী আর গরিব, এবাই হোলো ভারতবর্ষের প্রধান অংশ। এদের পয়সা, এদের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে যাবা সুখে আছে, তাবা অন্যায় করছে—বহু কোটি সাধারণ লোকের উপব এই কয়েকটি বড়লোক অবিচার করছে। এই পবিকল্পনা অনুসারে কাজ হ'লে বড়লোক নীচে নেমে আসবে, গরিব উপরে উঠে আসবে, সবাই মিলে এক হ'য়ে যাবে।

গান্ধীবাদের সারসংক্ষেপ

গান্ধীজীর সমস্ত মতবাদকে এবার মোটামুটি জানিয়ে দিচ্ছি।

হিংসায় হিংসা বেড়ে যায়, সুতবাং হিংসা দিয়ে শান্তি আসতে পারে না। তাই অহিংস হতে হবে। সব সময় এমন কাজ করতে হবে যেন হিংসার উৎপত্তি না হয়। অহিংস সংগ্রামের অস্ত্র হোলো সত্যাগ্রহ, প্রয়োজন ক্ষেত্রে আইন-অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ এবং কোনোরকম উপদ্রব না ক'বে অহিংস প্রতিবোধ।

সত্যকে জয়ী করবাব জন্যে সত্যাগ্রহ কবতে হবে। শ্রমিকদের দাবী নিয়ে অহিংসভাবে ধর্মঘট করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়েব পক্ষে লড়াই করা, গড়াব কাজ করা, সংগঠন করা—এ সবই সত্যাগ্রহের মধ্যে পড়ে। সত্যাগ্রহী ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবে। ত্যাগ ও সেবা হবে তার আদর্শ। আপোষে ব্যবস্থা করবার জন্যে সর্বদা সত্যাগ্রহী চেষ্টা করবে। এমন দাবী সত্যাগ্রহী করবে না, যা অসম্ভব ও অসঙ্গত। সত্যাগ্রহী বিরুদ্ধপক্ষের দোষ না খুঁজে নিজের দোষ খুঁজবে।

বড় যন্ত্র থাকলে বেশী মাল তৈরী করবার নেশা জাগে। এই নেশা থেকে ক্রমে আসে উপনিবেশের লোভ। তা থেকে

আসে যুদ্ধ। বড় যন্ত্র লোককে বেকার ক'রে দেয়—মানুষকে ক'রে তোলে অমানুষ। তাই বড় যন্ত্র ছাড়তে হবে যথাসম্ভব। তার জায়গায় ছোট যন্ত্র আর কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ছোট যন্ত্র এবং কুটিরশিল্পে বেশী লোক কাজ পাবে, তাতে বেশী লোক খেতে পাবে। বেশী উৎপাদনের নেশাও হতে পারবে না, যুদ্ধও এড়ানো যাবে।

ছুনিয়ার সব দেশে রাষ্ট্রেব হাতে থাকে টাকা আর ক্ষমতা। তারা সেখান থেকে কম-বেশী সাধাবণ লোককে দেয়। কোনো দেশে তাই আজ পর্যন্ত সত্যিকারেব স্বাধীনতা আসে নি সব লোকের জন্যে। গান্ধীজীর মত ঠিক এর উল্টো। ভাত এবং কাপড়ের ক্ষমতা সাধারণ লোকের হাতেই থাকবে, কাবণ প্রধানতঃ এই ছুটো জিনিসের জন্যেই গরিবের মাথা কেনা থাকে বাষ্ট্র বা বড়লোকের কাছে। তাঁর মত হোলো, সাধারণ লোকেব হাতেই আসলে ক্ষমতা থাকবে, তারা নিজেদেব সুবিধার জন্যে নিজেদেরই ঠিক-করা বাষ্ট্রকে, জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে দেবে কিছু ক্ষমতা আর টাকা।

নিজেদের স্বাধীনতা নিজেরাই আনবার এবং রাখবাব জন্যে আঠারোটা কাজের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাবার কথা তিনি বলেছেন। এই আঠারোটা কাজের ভেতব দিয়েই সাধারণ লোকের ক্ষমতা সাধারণের হাতেই চ'লে আসবে।

সাতটা গ্রাম মিলে এক-একটা পঞ্চায়েত করতে হবে। গ্রামের লোকদের বেছে দেওয়া লোকই পঞ্চায়েত চালাবে।

তাতে সব সময়েই লোক সুখে বাস করতে পারবে, কাবণ, তাদেরই পঞ্চায়েতের উপর ভাব রয়েছে তাদের সুখ-শান্তিব, খাওয়া-পবাব, স্বাস্থ্য-শিক্ষার, আমোদ-প্রমোদেব।

স্বাধীন ভাবতের পবিকল্পনায় তিনি জানাচ্ছেন, সাধারণ লোকেব সুবিধা দেখাই হবে রাষ্ট্রেব এবং পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্য। সাধারণ ধর্মমতে চলবাব অধিকাব সবাব থাকবে। বড়লোক-গরিবেব পার্থক্য থাকবে না। দেশে অশিক্ষিত কেউ থাকবে না, কেউ থাকবে না না-খেয়ে।

অনেক বই আছে গান্ধীজী সম্বন্ধে। বড় হ'য়ে সেগুলো প'ড়ো। গান্ধীবাদ সম্বন্ধে জানতে পারবে আরো অনেক কথা।

শেষের কথা

সত্যরক্ষায় বজ্রের মত কঠোর অথচ ব্যবহারে শিশুর মত সরল ; দেশবাসীকে এতটুকু কেউ ঠকাতে চাইলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ধ'রে ফেলেন, নিজে চান না ছুনিয়ার কাউকে ঠকাতে ; লোকে দোষ করলে, অত্যাচাব করলে বলেন, 'ভুল করেছে'—অসীম ক্ষমায় তাকে বুকে টেনে নেন ; এতটুকু গর্ব নেই, ভুল করলে সবাইকে বলেন, 'আমি ভুল কবেছি,' বলেন, 'ছুনিয়াব ইতিহাস হচ্ছে প্রতিহিংসার ইতিহাস—ও-পথে শান্তি আসবে না। চরকায় সুতো কাটো, খদ্দর পরো, নিজের কাজ নিজে করো, পরের সেবা পাবতপক্ষে নিও না, গ্রামে ফিবে যাও, কুটিরশিল্পে নজর দাও, শিক্ষা দাও আব নাও, মদ ছাড়ো, অস্পৃশ্যতা ছাড়ো, অহিংসায় বিশ্বাস কবো, সত্যকে জয়ী ক'বে তোলো।' রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী নিয়ে বড়লাটকে বললেন, 'দরিদ্র ভাবতবাসীব পক্ষ থেকে হাঁটু গেড়ে আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি, বাজবন্দীদেব ছেড়ে দাও।' আবার স্পষ্ট ভাষায় সেই বড়লাটকেই বলেছিলেন, 'যে দেশেব লোকের আয় দিনে ছ'পয়সা, সেই দেশেব শাসনকর্তা হ'য়ে মাসে একুশ হাজার টাকা মাইনে নিতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।'—ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান, পৃথিবীব সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, 'হে রুদ্র সন্ন্যাসী' মহাত্মা, তোমায় প্রণাম করি।

বিষয়-সম্পত্তি সব ছেড়েছেন, একখানা বীমাব কাগজ ছিলো, তাও সঁপে দিয়েছেন ভগবানের পায়ে। প্রাণ দিয়ে অনুভব কবলেন দেশেব গরীবেব ব্যথা আব দাবিদ্র্য—তাই তাবা যা খায়, তাই খেতে সুরু করলেন, তাবা যা পবে, নিজেও পবলেন তাই। দবকাব হ'লে বড়লোকেব মোটরেও চড়েন, আবার ভাই ব'লে হরিজনদের মধ্যে গিয়েও বাস কবেন। তাঁব মতই তো তাই, ধনীদের নামিয়ে এনে এবং গরীবদেব উঠিয়ে নিয়ে সব এক ক'রে দেওয়া।

'জীবনযাত্রা হবে সবল আব চিন্তা হবে মহৎ'—এই তাঁর আদর্শ, এই তাঁব স্বাধীনতার মূল কথা। তিনিই পৃথিবীকে শেখালেন, মানুষেব স্বাধীনতা মানুষেব হাতে, সে স্বাধীনতা তাদের অর্জন ক'বে নিতে হবে—একতা হোলো তাদেব বল, অহিংসা হোলো তাদেব অস্ত্র। দীনু মেথরকে আব কানাই চাষীকে, বামু তেলীকে আব গোবিন্দ মুচিকে, সকলকে ডেকে বলতে হবে, 'তোময়া উঠে দাঁড়াও, ওই দেখ স্বাধীনতার স্বর্ণতোড়ণ, ওই স্বাধীনতা অর্জন কবাব ক্ষমতা তোমাদেরই হাতে আছে, কোনো অন্যায তোমাদের দাবিয়ে বাখতে পাববে না।'

" .... ডাকিয়া বলিতে হবে,—
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে-অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"

কয়েকটা লোক কোটি কোটি লোকেব পিঠে চ'ড়ে কলুব বলদেব মতো যে দিকে ইচ্ছে ঘোরাবে, এটা অন্যায়, এটা অসত্য ; যাবা তা করবার চেষ্টা করছে তারা মিথ্যে চেষ্টা করছে—কারণ, 'কয়েকটি লোক সব লোককে কিছু সময়েব জন্যে ভুলিয়ে রাখতে পারে, অথবা, কিছু লোককে সব সময়ের জন্যে ভুলিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু সব লোককে সব সময়েব জন্যে ভুলিয়ে রাখতে পাবে না।' স্বাধীনতা মানুষেব অধিকার, সে স্বাধীনতায় সকলেব সমান দাবী থাকবে, এটাই হোলো সত্য। এই সত্যের জন্যে ভাবতবর্ষেব চল্লিশ কোটি নবনারীর আশি কোটি হাত যদি আজ থেকে পবিশ্রম করতে সুরু করে প্রাণমন ঢেলে দিয়ে, তবে সত্যের বিবাট জয় নিশ্চয় হবে—'মিথ্যা' ভেঙে-চুরে, গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে মাটিতে মিশে যাবে। সত্য কখনও হেরে যেতে পাবে না মিথ্যার কাছে।

"সত্যেব নাহি পবাজয় !
হ'ও ধরমেতে ধীর, হ'ও করমেতে বীব,
হও উন্নতশির, নাহি ভয় !"

গান্ধীজীর জীবনকথা

দক্ষিণ-আফ্রিকাব ডাববান বন্দরে সেদিন বড় গণ্ডগোল। বন্দরে জলের মাঝে একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে। তীরের উপর অনেকগুলো লালমুখো গোবা। তাবা চ্যাঁচাচ্ছে কেবল; চেঁচিয়ে হৈ হৈ ক'রে, ঠেলাঠেলি ক'বে সাবা বন্দরটাকে যেন একেবারে মাথায় তুলে ফেলছে। শোনা গেল, যে জাহাজটা থেমে আছে, তার একটা লোককেও তারা নামতে দেবে না তীরে। দক্ষিণ-আফ্রিকাব নাতাল বলে একটা দেশে থাকে সেইসব গোবা। নাতালে ভাবতবর্ষেব যে-সব লোক থাকতো তাদের ওপর বড় অত্যাচার চলতো এই সাহেবদেব। গোরারা ভেবেছিলো, ঐ জাহাজে ক'বে ভারতবর্ষের যে-সব লোক এসেছে, তাবা সকলেই নাতালে আসবে তাদেব জাতের দল ভাবি করতে। তাই জাহাজেব লোকদের গোরাবা কিছুতেই নামতে দিতে চাইছিলো না।

জাহাজেব ডেক্‌এ একজন লোক দাঁড়িয়ে—সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-পুত্র। জানা গেল, এই লোকটাব উপবেই গোবাদের রাগ। লোকটি নাকি ভাবতবর্ষে গিয়ে গোরাদেব নামে খুব নিন্দা করেছে, আব সে নাকি জাহাজ ভর্তি ক'রে ভারতবর্ষের লোক এনে নাতালদেশটাকে ছেয়ে ফেলে দিতে চাইছে।

জাহাজের কোন লোককে নামতে দেওয়া হোলো না পাঁচদিন পর্যন্ত। অবশেষে নামবাব আদেশ হোলো। দুপুরের একটু পরে সেদিনকাব সেই লোকটি তেমন ক'রে ডেক্‌এর উপর দাঁড়িয়ে। জাহাজেব ক্যাপ্টেন এসে বললেন, "শুনুন, মিঃ এস্কম্ব নামে আপনার এক বন্ধু জানিয়ে দিলেন যে, আপনি দিনেব বেলায় তীরে নামবেন না। গোবাবা আপনার উপর খুব চটে আছে। সন্ধ্যাব পব যাবেন।"

ভদ্রলোক বললেন—"আচ্ছা।"

বিকালবেলা লোকটিব বন্ধু লাটন সাহেব এসে বললেন, "কোন ভয় নেই, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আপনাব স্ত্রী-পুত্রদের আমি গাড়ি ক'বে রুস্তমজীর বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

লাটন সাহেবেব কথামতো লোকটিব স্ত্রী-পুত্রদেব পাঠিয়ে দেওয়া হোলো রুস্তমজীব বাড়ি। এঁবা দু'জন হেঁটে চললেন। পথে যেতে যেতে কয়েকটি গোবা লোকটিকে চিনতে পাবলো। তাবা দল যোগাড় কবে তাঁব পিছু নিলো। লাটনসাহেব ভয় পেয়ে একটা বিকশা ভাড়া কবতে চাইলেন। ভদ্রলোকটি বললেন, "দেখুন, বিকশা চড়তে আমাব ভালো লাগে না, আব আমি যখন কোনো অন্যায় কবি নি, তখন ভয় পাবারই বা কি আছে!"

ভদ্রলোকেব মনেব জোব দেখে লাটনসাহেবও আব কিছু বললেন না।

কিন্তু গোরারা ক্রমেই খেপে যেতে লাগলো। ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগলো। তারা লোকটির উপর ছুঁড়তে লাগলো ঢিল, পচা ডিম; লাথি মাবতে সুরু কবলো, তাঁব পাগড়িটা দিলো উড়িয়ে। বাস্তাব পাশের দেওয়াল ধ'রে লোকটি দাঁড়াবাব চেষ্টা করলেন, কিন্তু দাঁড়ানো অসম্ভব। তাঁব উপব গোবাদের কিল, চড়, ঘুসি তখন পুরোদমে চলেছে।

পুলিসের বড়সাহেব খবব পেয়েই সেপাই পাঠিয়ে দিলেন ভদ্রলোককে বাঁচাবাব জন্যে। তাদের সঙ্গে লোকটি থানায় গেলেন, কিন্তু থাকতে চাইলেন না বেশীক্ষণ। বললেন, "আমি ফিবে যাবো, আমাকে ওরা আর কিছু করবে না, ভুল বুঝতে পারলেই তারা চুপ ক'বে যাবে।" পুলিসেব লোকেরা সঙ্গে গিয়ে লোকটিকে রুস্তমজীব বাড়িতে রেখে এলো। সেখানে তাঁব স্ত্রী-পুত্র ছিলেন।

সেখানে গিয়েও নিস্তাব নেই। গোরাব দল এসে যা তা বলতে লাগলো, চেঁচাতে লাগলো, 'ওকে আমাদেব হাতে দিযে দাও, একবাব দেখে নেবো।' পুলিসের বড় সাহেব লুকিয়ে তাঁকে অন্য জায়গায় সবিয়ে দিয়ে এ যাত্রাও বাঁচিয়ে দিলেন।

পবে সেই দেশেব প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ভদ্রলোককে জানালেন, 'আপনি যদি ইচ্ছা কবেন, গোবাদেব বিরুদ্ধে মামলা আনতে পাবেন, এ রকম অন্যায় ব্যবহাব তারা করেছে ব'লে আপনি সুবিচার পাবেন।'

কিন্তু সেই ভদ্রলোক যা উত্তর দিলেন, পৃথিবীর লোক তাতে অবাক হ'য়ে গেলো। তিনি বললেন, 'না, ওদের বিরুদ্ধে মামলা আমি করবো না। ওরা ভুল ক'রে আমাকে মেরেছে। আমি ওদেব সেই ভুল বুঝিয়ে দেবো ভালো কথায়। আমি বিশ্বাস করি, তা হ'লে ওবা আমার বন্ধু হবে।'

দেখো, আমাদের কেউ একটা অন্যায় কথা বললে তাকে অমনি মাবতে ছুটি, খালি ভাবতে থাকি, কি ক'বে তাকে জব্দ করবো, ক্ষমা তাকে কিছুতেই কবতে পাবি নে, কিন্তু দেখো দেখি এই লোকটিব দিকে! কত বড় তাঁব মন! কত উদাব হৃদয়! মানুষেব প্রতি কত ভালোবাসা! অত্যাচারীব উপব কী অসীম ক্ষমা!

এই লোকটি কে জানো?

বলতে আমাব গর্ব হচ্ছে, সেদিনকাব সেই লোকটিই হলেন আজকেব বিশ্ববিখ্যাত মহাত্মা গান্ধী! বলতে আমাব বুক ফুলে উঠছে, সমস্ত দুনিয়ার সামনে যিনি এতবড় একটা শিক্ষা দিলেন, তিনি আমাদেবই জাত-ভাই, আমাদেবই ভাবতবর্ষেব জল-বায়ু-মাটি দিয়ে তিনি গড়া!

* * *

মহাত্মা গান্ধীব পুবো নাম মোহনদাস কবমচাঁদ গান্ধী। তাঁর জন্ম হয় পোরবন্দবে ইংরেজি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর।

তাঁর বাবা ছিলেন বাজকোট বাজ্যেব দেওয়ান। তিনি

ছিলেন সাহসী, উদার এবং রাগী। মা ছিলেন অত্যন্ত ভালোমানুষ, ধর্ম-কর্ম পূজো-অর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

রাজকোটে পাঠশালায় কিছুদিন প'ড়ে মোহনদাস হাইস্কুলে ভর্তি হলেন বাবো বছর বয়সে। স্কুলে তিনি ভালো ছেলে বলেই পবিচিত ছিলেন।

ছোটবেলা অত্যন্ত লাজুক ছিলেন গান্ধীজী। সব সময় চুপ ক'রে থাকতেন। ছেলেদেব সঙ্গে বড় একটা মিশতেন না। ছুটি যেই হোলো, এদিক-সেদিক চাওয়া নেই, একেবারে ছুট মারতেন বাড়ির দিকে।

পড়াশুনায় দিগ্‌গজ হ'য়ে ওঠবাব ইচ্ছে তাঁর খুব বেশী ছিলো না। কিন্তু ব্যবহার বা স্বভাব সম্বন্ধে লোকে যেন তাঁকে কিছু বলতে না পারে, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো খুব।

শুনে অবাক হবে, মোহনদাসেব বিয়ে হয়েছিলো মাত্র তেবো বছর বয়সে। তাঁব জীবন-কাহিনীতে তিনি এত কম বয়সে বিয়ে কবাব জন্যে লজ্জা-প্রকাশ কবেছেন। তাতে লিখেছেন, অত কম বয়সে বিয়ে করা কাবওই উচিত নয়।

সেই সময় তিনি স্কুলে পড়তেন। একজন খাবাপ বন্ধুব সঙ্গে মিশে লুকিয়ে লুকিয়ে হোটেলে গিয়ে তিনি মাংস খেতে আরম্ভ করলেন; অথচ বাড়িতে তাঁদেব মাংস খাওয়া বাবণ। বাড়িতে এসে কিছু খেতে পাবতেন না। মা জিজ্ঞেস করলে মিথ্যা কথা বলে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু মিথ্যা কথা কওয়াব জন্যে তাঁর মনে খুব দুঃখ হোলো। ভাবলেন, 'মাংসও আর

খাবো না, মিথ্যা কথাও আর বলবো না।' মনের জোর তাঁর এমনই যে, মাংস তো ছেড়ে দিলেনই, জীবনে আর কোনোদিন মাংস খেলেন না। ছোটবেলা সিগারেট খেতে সুরু করেছিলেন, কিন্তু মনের জোরে তাও ছেড়ে দিলেন।

* * *

আঠারো বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিক পাস করলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উনিশ বছর বয়সে তাঁকে বিলাত পাঠানো হোলো ব্যারিস্টার হ'য়ে আসার জন্যে। বিলাত যাবার সময় জাহাজের একজন বলেছিলেন—'আপনি যে মদ আর মাংস খান না, বিলেতে গেলে ও দুটো আপনাকে খেতেই হবে।'

গান্ধীজী উত্তর দিলেন—'যদি তাই হয়, বরং আবার দেশেই ফিরে আসবো, তবু মদ আর মাংস আমি কিছুতেই খাবো না।'

বিলেতে পৌঁছে তাঁর লোভ হোলো ফ্যাসন করার দিকে। দেশী পোশাক ছেড়ে দিয়ে হ্যাট কোট প্যাণ্ট নেকটাই পরতে লাগলেন। ওদের সমাজে মেশবার জন্যে নাচ শিখতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু একদিন ভাবলেন, আমি এসেছি লেখাপড়া শিখবার জন্যে, এদের সমাজে মিশবো বলে তো আসিনি। সেদিন থেকেই ওদের অনুকরণ করা ছেড়ে দিলেন।

ব্যারিস্টারি পড়তে-পড়তেও তাঁর হাতে সময় থাকতো অনেক। তাই স্থির করলেন, বিলেতের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করবেন। পরীক্ষায় প্রথমবার ফেল করলেন। কিন্তু

জোর ক'রে প'ড়ে দ্বিতীয়বার ভালোভাবে পাস করলেন। এই সময় নিজের প্রায় সব কাজ নিজেই তিনি ক'রে নিতেন।

বিলেতে থাকতে থাকতে কয়েকজন ধার্মিক ভক্ত লোকের সঙ্গে মিশে তাঁর মনেব খুব উন্নতি হয়। কিছুদিন পরে তিনি ধর্মগ্রন্থ 'গীতা' পড়লেন। নিজেব জীবনীতে গান্ধীজী বলেছেন, 'গীতাই সবচেয়ে ভাল বই। মন খাবাপ হ'লে এই গীতা প'ড়ে আমাব আনন্দ হয়।' খৃস্টানদেব ধর্মের বই 'বাইবেল' এবং মুসলমানদেব ধর্মগ্রন্থ 'কোবান'ও তাঁর কাছে খুব ভালো লাগে।

* * *

তিন বছব পবে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে ব্যাবিস্টার হ'যে গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, মা মারা গেছেন কিছুদিন আগে। মনেব দুঃখে তিনি কাতব হ'য়ে উঠলেন।

কিছুদিন পবে দেশেই একটা অফিস খুলে বসলেন। মাসে তাঁব তিনশো টাকা রোজগাব হতে লাগলো।

* * *

দিন একবকম কেটে যাচ্ছিলো। একদিন দক্ষিণ-আফ্রিকার শেঠ আব্দুল্লা নামে একজন মস্তবড় ব্যবসায়ী দাদাকে এক চিঠি লিখলেন—'একটা মস্তবড় মামলা লড়ছি। আপনাব ভাই তো ব্যাবিস্টাব, তিনি যদি এসে মামলাটা দেখাশোনা কবেন, বড় উপকাব হয়। সমস্ত ব্যবস্থার ভার

আমার।' গান্ধীজী এ সুযোগ ছাড়লেন না। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় গেলেন।

শেঠ আব্দুল্লা সেখানকার উকিলদের সঙ্গে তাঁব পরিচয় করিয়ে দিলেন। একদিন তিনি আদালতে ঢুকতে যাবেন, শেঠ আব্দুল্লা বললেন, 'মুসলমানী-পোশাক-পবা মুসলমানই কেবলমাত্র পাগড়ি প'রে আদালতে ঢুকতে পারে, তা ছাড়া ভারতবর্ষেব অন্য কোনো সম্প্রদায়েব লোকেব পাগড়ি মাথায় দিয়ে আদালতে ঢোকবাব নিয়ম নেই, আপনি পাগড়ি খুলে যান।'

আইনেব এ অপমান গান্ধীজীব মনে বড়ো লাগলো। খববের কাগজে এই সম্বন্ধে তিনি লিখলেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাঁব বেশ নাম রটে গেলো।

কয়েকদিন পবে বেলগাড়িব প্রথম শ্রেণীতে চ'ড়ে গান্ধীজী এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। বেলেব এক কর্মচাবী এসে তাঁকে জোব ক'বে 'কালা-আদমি' ব'লে নামিয়ে দেয়। এতে তাঁব মনে বড় লাগলো। তিনি স্থিব কবলেন, ভাবতবর্ষের লোকেব এত অপমান! তাদেব উপব এই অত্যাচার দূব কবতেই হবে!

লোকেব দুঃখ দূব কবাব এই যে নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিলো, সে নেশা কখনও তাঁকে ছাড়েনি, জীবনেব শেষ-দিন পর্যন্ত সে নেশা তাঁব ছিলো।

দেশে কি কি নিয়ম চলবে, সেটা স্থির করে সেই দেশের আইন সভা। নাতালের আইন সভা সেবার ঠিক করলো, ভারতবর্ষের লোকদের ভোট দিতে দেওয়া হবে না। গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। দশ হাজার লোকের সই নিয়ে মন্ত্রী রিপনের কাছে তিনি একটা চিঠি পাঠালেন। সরকার বা দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিবাদ সেই প্রথম।

গান্ধীজী দেশে ফিবে আসতে চাইলেন এর পর। নাতালের লোকেরা কিছুতেই তাঁকে ছাড়লো না। তিনি সেখানেই থেকে গেলেন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নাতালের ভারতীয়দের নিয়ে এক সমিতি প্রতিষ্ঠা কবলেন। তার নাম দিলেন নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস।

* * *

কয়েক বছব কেটে গেলো। এব মধ্যে গান্ধীজী সেবাব কাজ সুরু ক'বে দিয়েছেন। তাঁব উৎসাহে একটা ছোটখাট হাসপাতালও খোলা হয়েছে। বোগীর সব বকম সেবাশুশ্রূষায় তিনি ওস্তাদ হ'য়ে উঠছিলেন। এই সেবাব কাজে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর স্ত্রী কস্তুরবা।

কিছুদিন পবে দক্ষিণ-আফ্রিকাব বুয়োবদেব সঙ্গে ইংবেজের যুদ্ধ লেগে গেলো। গান্ধীজী স্থিব করলেন, এই যুদ্ধে দল বেঁধে সেবাব কাজ কবতে হবে। তাঁর ডাকে এগাবোশো লোক জুটে গেলো। যুদ্ধে যে-সব সৈন্য আহত হতো, তাদের

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, হাসপাতালে গিয়ে তাদের সেবাশুশ্রূষা করা, এই সমস্ত সেবাব কাজ ক'রে গান্ধীজী আর তাঁর দল খুব নাম করলো।

যুদ্ধ মিটে গেলো। গান্ধীজী ভাবতবর্ষে ফিববার তোড়-জোড় করতে লাগলেন। বন্ধুবা আব নাতালের লোকেবা বহু রকম দামী উপহার তাঁকে দিলো। গান্ধীজী বললেন, 'এ সব উপহার আমি নেবো না, সাধারণ লোকেব সেবা ক'রে যা উপহাব আমি পেয়েছি, সাধারণ লোকেবই তা প্রাপ্য।' তাঁব স্ত্রী কস্তুরবা অত টাকার জিনিস ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু গান্ধীজী তাঁকে বুঝিয়ে সেগুলো ফেবৎ বেখে গেলেন।

যথাকালে দেশে ফিবে গিয়ে বোম্বাইতে তিনি অফিস খুলে বসলেন।

* * *

আবাব দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ডাক পড়লো। দক্ষিণ-আফ্রিকায় গিয়ে গান্ধীজী দেখলেন, সেখানকাব ভাবতীয়দের অবস্থা আগেব চেয়েও খারাপ। আগের চেয়েও বেশী অত্যাচাব চলছে তাদেব উপর।

নূতন উৎসাহ নিয়ে তিনি কাজে নামলেন। এই সময় বিশ্ববিখ্যাত লেখক এবং কবি রাস্কিনেব 'আনটু দি লাস্ট' **(Unto the last)** নামে একখানা বই প'ড়ে তাঁব মনেব প্রচুর উন্নতি হোলো। সেই বইয়ের তিনটে কথা তিনি মনপ্রাণ

দিয়ে গ্রহণ করলেন। কথা তিনটে হচ্ছে ঃ—(১) সকলের ভালো হ'লেই আমার ভালো হোলো, (২) সকলের কাজের দাম একরকম হওয়া উচিত, কারণ, বেঁচে থাকার দরকার সকলেরই সমান, (৩) শ্রমিকদের আর চাষীদের জীবনই হোলো খাঁটি জীবন।

মিঃ ওয়েস্ট নামে এক ইংরেজ বন্ধুর সাহায্যে গান্ধীজী 'ফিনিক্স' নামে এক গ্রামে এক কারখানা তৈরী করলেন। নাতালের অনেক লোক সেখানে এসে থাকতে লাগলেন। যতটা পারা যায় সাদাসিধে ভাবে গান্ধীজী এবং ফিনিক্স-আশ্রমের অন্যান্য লোকেরা থাকতে লাগলো। পায়খানা পরিষ্কার করা, ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি কাজও তাঁরা নিজেরাই করতেন।

* * *

কিছুদিন পরের কথা। গান্ধীজী তখন যে দেশে বাস করছেন, তার নাম ট্রান্সভাল। ট্রান্সভালের গভর্ণমেণ্ট তখন এক আইন জারি করছিলো—যত ভারতীয় সেখানে আছে, তাদের সকলকে একখানা পরোয়ানা সই ক'রে অমুক তারিখের মধ্যে নাম রেজেস্ট্রি করতে হবে। না হলে, তারা আর ট্রান্সভালে থাকতে পারে না। এই ব্যাপারে এমন কতকগুলো প্যাঁচ ছিলো, যাতে বহু ভারতীয় ট্রান্সভাল ছেড়ে চ'লে আসতে বাধ্য হোতো।

গান্ধীজী সকলকে নাম রেজেস্ট্রি করতে বারণ করলেন।

তিনি বললেন, 'এ আইন আমবা কেউ মানবো না। তাব জন্যে যত দুঃখ সইতে হয়, আমরা সইবো!' এই বকম আন্দোলন করাকে গান্ধীজী নাম দিলেন, 'সত্যাগ্রহ'। সত্যেব জন্য যে আন্দোলন, সেটা হোলো সত্যাগ্রহ।

দলে দলে লোক সত্যাগ্রহ আবম্ভ করলো আব দলে দলে জেলে যেতে সুরু করলো। গান্ধীজীকে জেলে নেওয়া হোলো সবার আগে। কিছুদিন পবে গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীব সঙ্গে মিটমাট কবাব জন্যে বললো, 'ভাবতীয়েবা পুবানো পবোয়ানা দিয়ে নূতন পবোয়ানা সই ক'বে নিক। এব জন্যে কোন ভারতীয়কে বাধ্য কবা হবে না। সকলে এ বকম করলে, এই আইন উঠে যাবে, আব যাবা জেলে গেছে, তাদেব ছেড়ে দেওয়া হবে।'

গান্ধীজী সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। সকলে রাজীও হোলো। সত্যাগ্রহের জয় হোলো।

* * *

কিন্তু সে আইন গভর্ণমেণ্ট তুললো না। জেলে যাবা গিয়েছিলো, তাদেরও ছাড়া হোলো না। গান্ধীজী আবাব উঠে-পড়ে লাগলেন। গবর্ণমেণ্টকে আবাব তিনি অনুবোধ জানালেন, কিন্তু সে কথা কানে তুললো না তারা।

গান্ধীজী সমস্ত ভাবতীয়দেব ডেকে সকলেব পবোয়ানা এক সঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন।

আবার আইনসভা একটি আইন পাস করলো, নূতন

কোনো ভারতীয়কে ট্রান্সভালে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গান্ধীজী আবার সব লোককে নিয়ে এই আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। বহু লোক জেলে গেলো। জেলে যারা গেলো, তাদের বাড়িব লোকদের রাখবার জন্যে গান্ধীজী এক আশ্রম খুললেন। নানা রকম জিনিসপত্র তৈবী ক'রে তারা তাদেব খরচপত্র চালাতে লাগলো। এই আশ্রমের নাম দেওয়া হয়েছিলো 'টলস্টয় আশ্রম।'

* * *

ট্রান্সভালেব ভারতীয়দের কাছ থেকে বছবে ৪৫ টাকা ক'বে একটা ট্যাক্স বা কর নেওয়া হোতো। আব একটা আইন হোলো, ভাবতীয়দেব মধ্যে যে বিয়ে হবে, সে বিয়েকে বিয়ে ব'লে মেনে নেওয়া হবে না। গান্ধীজীব বহু অনুরোধ সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট এ দুই আইন তুললো না। গান্ধীজী সত্যাগ্রহের জন্যে তৈবী কবতে লাগলেন টলস্টয় আশ্রমের লোকদের। হাজাব হাজার শ্রমিক সত্যাগ্রহে যোগ দিলো। বহু স্ত্রীলোকও সত্যাগ্রহে যোগ দিলো।

বিবাট ভাবে দল বেঁধে সবাই চললো ট্রান্সভালের দিকে—দুই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবাব জন্যে দলে দলে লোক গ্রেপ্তাব হোলো। গান্ধীজী এবং তাঁর দুই ইংরেজ বন্ধু—মিঃ পোলক এবং মিঃ কেলেমবেক সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। তাঁদের জেল হোলো তিন মাস ক'রে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে এই

ব্যাপারে খুব সাহায্য করছিলেন গান্ধীজীকে। অবশেষে গভর্ণমেণ্ট ঐ আইন ছুটো তুলে দিতে বাধ্য হোলো। সত্যাগ্রহের বিরাট জয় হোলো।

* * *

এর পরে গান্ধীজী বিলেত গিয়ে মহামতি গোখ্‌লেকে নিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। এখানে এসেও কাজের গতি তাঁর থামলো না।

বোম্বাইএর বিরামগাঁও স্টেশনে যাত্রীদের কাছে একটা ট্যাক্স নেওয়া হোতো অন্যায় ভাবে। গান্ধীজীর চেষ্টায় ভারত-গভর্ণমেণ্ট এই ট্যাক্স তুলে দেয়।

কিছুদিন পরে গান্ধীজী শান্তিনিকেতনে গেলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব ব'লে ডাকতেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনিই গান্ধীজীকে উপাধি দিয়েছিলেন 'মহাত্মা'।

এই সময় তাঁর অকৃত্রিম উপকারী গোখ্‌লে মারা যাওয়াতে তিনি বড় ছুঃখ পেলেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে আমেদাবাদে তিনি সত্যাগ্রহ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেকে টাকা-পয়সা দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। আমাদের দেশের বড়জাতের লোকেরা যাদের ছুঁতেও ঘৃণাবোধ করে, গান্ধীজী তাঁদেরও নিজের আশ্রমে জায়গা দিলেন।

ভারতবর্ষ থেকে নানা দেশে কুলি-মজুর পাঠানো হোতো

গভর্ণমেণ্ট থেকে। গান্ধীজী বললেন, এ নিয়ম তুলে দিতে হবে! তিনি অনেক চেষ্টা করার পর এ নিয়ম তুলে দেওয়া হয়।

* * *

চম্পাবণ সত্যাগ্রহ গান্ধীজীব জীবনেব একটি কীর্তি। চম্পারণ হোলো বিহাবেব একটা জায়গা। সেখানে চাষী ছিলো অনেক। গভর্ণমেণ্টেব নিয়ম ছিলো, প্রত্যেক চাষীকে তাব প্রতি বিঘা জমির তিন কাঠাতে নীলচাষ কবতেই হবে। নীলকুঠিব সাহেবেবা নিতো তাব আয়—তাবাই ছিলো জমির মালিক।

এই বিশ্রী নিয়ম তুলে দেবার ব্যবস্থা কববাব জন্যে এবং চাষীদের দুঃখ দূব কববাব জন্যে গান্ধীজী চম্পাবণে গেলেন। কাজ সুরু কবাব আগে পুলিস তাঁকে নানা ভাবে জ্বালাতন কবলো। সে সব সত্ত্বেও তিনি কাজ আবম্ভ কবলেন। চাষীদের ডেকে তাদেব দুঃখ-দুর্দশাব কথা সব লিখে নিতে লাগলেন। তাবপব সেই সব লেখা পাঠিয়ে দিলেন গভর্ণমেণ্টের কাছে। গভর্ণমেণ্ট অবশেষে সেই নিয়ম উঠিয়ে দিলো। ঠিক হোলো, নীলকুঠিব সাহেবরা অন্যায়ভাবে যে-সব টাকা নিয়েছে, সেগুলোর কিছুটা অংশ ফেবৎ দিয়ে দেওয়া হবে চাষীদেব। সত্যাগ্রহেব আবাব জয় হোলো।

* * *

এর পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আমেদাবাদে মিলেব শ্রমিকদের

পক্ষ হ'য়ে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ সুরু করলেন। মিল-মালিকবা মিটমাট করতে রাজী হোলো না। গান্ধীজী উপোস করতে আবম্ভ কবলেন। বললেন, 'যতদিন না মিলের মালিকেবা মজুরদেব সঙ্গে মিটমাট করবেন, ততদিন আমি উপোস ক'রে থাকবো—কিছুই খাবো না।' এ বকম উপোস ক'বে থাকাব নাম 'অনশন সত্যাগ্রহ'। যাহোক, শেষে মিল-মালিকবা শ্রমিকদের কথা মেনে নেবার পর তিনি উপোস করা ছাড়লেন। এই আন্দোলনই ভাবতে প্রথম শ্রমিক-আন্দোলন।

* * *

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী জুড়ে যে মহাযুদ্ধ সুরু হয়, তাতে গান্ধীজী ইংরেজদের সাহায্য কবেছিলেন। তাঁব ডাকে ভাবতের বহু লোক সৈন্য হ'য়ে ইংবেজদেব সাহায্য কবে। যুদ্ধে সাহায্য কবলে, ভাবতবাসীদেব অনেক কিছু দেবাব কথা ইংবেজ বলেছিলো, কিন্তু কিছুই তারা দিলো না। পাঞ্জাবের জালিনওআলাবাগে ভারতীয়েবা তাই প্রতিবাদ কববার জন্যে জমায়েত হোলো। শত শত লোককে কুকুবের মত গুলি ক'বে মারলো ইংরেজরা। মনে অত্যন্ত ব্যথা পেয়ে গান্ধীজী পাঞ্জাবে চ'লে গেলেন। পাঞ্জাবে ইংবেজদের অত্যাচার সম্পর্কে গান্ধীজী খোঁজ-খবর নিলেন। বড় হ'য়ে এই বিপোর্ট প'ড়ে দেখো, বুঝতে পারবে, ইংরেজরা ভারতবর্ষে কি ভাবে অত্যাচার করেছে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের শেষ হয়েছিলো। যুদ্ধে সাহায্য ক'রে ভারতবাসী ভেবেছিলো অনেক কিছু পাবে। তার বদলে 'রাউলাট আইন' নামে এক আইন পাস করতে গেলো ভাবত-গভর্ণমেণ্ট। এই আইন হোলো, বিনাবিচারে যতকাল খুশি যে কোনো ভারতীয়কে জেলে আটক রাখা। গান্ধীজী দেখলেন, এই আইন পাস হ'লে ভারতবর্ষের লোকের খুব ক্ষতি হবে। এই আইন পাস না করার জন্যে তিনি বড়লাটকে বহু অনুরোধ করলেন। কিন্তু কিছু ফল হোলো না। গান্ধীজী ঠিক করলেন, ৬ই এপ্রিল থেকে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে সত্যাগ্রহ-আন্দোলন চালাবেন।

আন্দোলন আরম্ভ হোলো। গান্ধীজীব সত্যাগ্রহের প্রধান কথা হোলো, কেউ কোনো অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে না। মারামারি, খুনখারাপি এসব একেবারেই মানা। কিন্তু যে সব লোক সত্যাগ্রহ করছিলো, তারা কয়েক জায়গায় খুনজখম করলো মনের উত্তেজনায়। গান্ধীজী বুঝলেন, সত্যাগ্রহ করার জন্য দেশ এখনও তৈরী হয় নি। তিনি মনে বড় দুঃখ পেলেন। মনের দুঃখে তিনি উপোস করলেন তিন দিন—সকলকে বললেন, 'সত্যাগ্রহ যারা করেছে, তাদের অনেকে অন্যায় করেছে, তাই উপোস ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত করলাম।'

গান্ধীজী বললেন, 'আইন হচ্ছে সকলের ভালোর জন্যে। ভালো আইন লোকের নিজের ইচ্ছায় মেনে নেওয়া উচিত, শাস্তির ভয়ে নয়। আবার যে আইন মানুষের ক্ষতি করবে,

সেটার প্রতিবাদের ব্যবস্থা করতে হবে—কিন্তু মারামারি ক'রে নয়। খারাপ আইনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দেশের লোক মারামারি করছে—সত্যাগ্রহ করার যোগ্য এবা হ'য়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন ক'রে আমি হিমালয়েব মতো বিবাট এক ভুল কবেছি।'

জালিনওআলাবাদ হত্যাকাণ্ডের পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ইংবেজের দেওয়া 'কাইজাব-ই-হিন্দ' পদক ত্যাগ কবেন। যুদ্ধে সাহায্য করার জন্যে তাঁকে এ পদক পুবস্কার দেওয়া হয়েছিলো। তিনি বললেন, 'ব্রিটিশেব দেওয়া সম্মানের আমবা অধিকাবী নই।'

* * *

দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ফিবে আসার কিছুকাল পরে গান্ধীজী কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস বললো, 'যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাদেব উপব এত অত্যাচার করেছে, আমাদের বিশ্বাস আর সাহায্যের বদলে পুবস্কার দিয়েছে কেবল বন্দুকের গুলি আর সঙ্গীনের খোঁচা, তাদের সঙ্গে কোনো ব্যাপারেই আমরা সহযোগিতা করবো না।' আন্দোলনেব জন্যে তৈরী হলেন গান্ধীজী। সাধারণ পোশাক পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে গান্ধীজী আটহাতি এক খদ্দরের কাপড় পরলেন। বললেন,—'আমার গরিব দেশের এই দুরবস্থায় আমি এর বেশী পাবাব অধিকাবী নই। ভাবতবর্ষ গবিবের দেশ, তাই আমিও গরিবের পোশাকই পরবো।'

গান্ধীজী কংগ্রেসীদের অসহযোগ-আন্দোলনের কৌশল ও নিয়ম শেখাতে লাগলেন। সকলকে সংযত থাকতে বল্লেন, যা-খুশি কাজ কবতে সবাইকে বারণ করলেন—শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে বললেন সবাইকে। কিন্তু আদেশ দিলেই তো আব সবাই নিয়ম মেনে চলে না। চৌরীচৌরা গ্রামে উত্তেজিত লোকেবা একটা থানায় আগুন ধরিয়ে দিলো। গান্ধীজী দেখলেন, লোকেরা শৃঙ্খলা মেনে চলতে শেখেনি। অসহযোগ-আন্দোলন ছেড়ে দিয়ে তিনি তখন কাজের ভিতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুরু করলেন দেশেব লোকদের।

১৯২২ খৃষ্টাব্দেব ১০ই মার্চ গান্ধীজীর জেল হোলো। গভর্ণমেণ্ট তাঁকে জেলে কতকগুলো সুবিধা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী বললেন, 'না, সুবিধা আমি চাই না, অন্যান্য বন্দী থেকে আলাদা ক'বে আমাব জন্যে কোনো সুবিধা আমি হতে দেবো না, সকলে যা পাবে, আমিও তাব বেশী নেবো না।'

জেলে ব'সে তিনি নিজের জীবনেব কাহিনী লিখতে আবম্ভ করলেন। তাব নাম 'আমাব সত্যেব সহিত পবীক্ষা।' এই বই পৃথিবীব জ্ঞানভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। বড় হ'লে এ বইখানি প্রত্যেকে প'ড়ো।

অসুখ হওয়াব জন্যে ছু'বছব পরেই জেল থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হলেন। এর পব কংগ্রেসের রাজনীতির কাজ

'স্বরাজ্য পার্টি'ব হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূব করাব কাজে নামলেন। হরিজনদের উন্নতি করাই হোলো তাঁব প্রধান একটা কাজ। যাদের লোকে ছুঁতেও ঘৃণা করে, সেইসব অস্পৃশ্য লোকেদের গান্ধীজী বলেন 'হরিজন'।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মাবা গেলেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে গান্ধীজী দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ কবলেন। তাই দিযে তৈবী করা হোলো কলকাতাব ভবানীপুরে 'চিত্তবঞ্জন সেবাসদন' নামে এক বিবাট এক হাসপাতাল।

এব পব গান্ধীজীব নির্দেশে সত্যাগ্রহ আবন্ত হোলো গুজবাটের বারদৌলি গ্রামে—সর্দার বল্লভভাইএব পরিচালনায়। চাষীদেব জমিব খাজনা বাড়ানোব বিরুদ্ধে তাবা প্রতিবাদ কবলো। গভর্ণমেণ্ট তাদেব ওপব অত্যাচারের ভয় দেখালো। অনেক কষ্টেব পব কৃষকদেব সত্যাগ্রহী জয়ী হোলো—গভর্ণমেণ্টেব সমস্ত শক্তিও তাকে বাধা দিতে পাবলো না।

দক্ষিণ-ভাবতে ত্রিবাঙ্কুর বাজ্যেব ভাইকম গ্রামেও গান্ধীজীব সত্যাগ্রহ সফল হোলো। ভাইকমের বাজপথ হবিজনদেব কাছে বন্ধ ছিলো। গান্ধীজীব নির্দেশে হবিজনবা সেই রাস্তাব উপর দিযে এগিয়ে চললো। পুলিস বাধা দিলো। রাস্তাব উপব বৃষ্টি হ'য়ে হাঁটুজল জমেছে—হবিজনবা ঠায় দাঁড়িয়ে বইলো তারই মধ্যে। অবশেষে সে রাস্তা হরিজনদেব জন্যে খুলে দেওয়া হোলো—অস্পৃশ্যদেব দাবীব জয়ধ্বজা উড়লো।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতা চাইলো, গান্ধীজী সমস্ত দেশ জুড়ে আন্দোলন চালাবেন ঠিক করলেন।

ভারতবর্ষে নুন তৈবী করবার সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিলিতি নুনই কিনতে হোতো। গান্ধীজী তাঁর সত্যাগ্রহী দল নিয়ে মাইলেব পর মাইল পেরিয়ে গ্রামেব ভিতব দিয়ে এগিয়ে চললেন সমুদ্রের উদ্দেশে, দণ্ডীর দিকে। বললেন, 'ভারতবর্ষেব লোকদের নুন তৈবী করতে দিতেই হবে। আমাব এই লবণ-আইন-আন্দোলন যদি বিফল হয়, আশ্রমে আব ফিববো না।' তাঁকে গ্রেপ্তাব করা হোলো। কিন্তু অবশেষে বড়লাট আরউইন বাধ্য হলেন গান্ধীজীব কথা মেনে নিতে। ঠিক হোলো, সমুদ্রেব তীরে যারা থাকবে, তারা নুন তৈবী করতে পারবে।

এর পবে বিলেতে 'গোলটেবিল বৈঠক' নামে এক সভা হয়। তাতে কংগ্রেসেব পক্ষ থেকে গান্ধীজী যোগদান কবেন। সেখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁকে সাদবে নিজেব বাড়িতে নিমন্ত্রণ কবলেন। সমস্ত পৃথিবী সেদিন সম্মান জানিয়েছিলো ভারতবর্ষেব এই 'অর্ধনগ্ন ফকির'কে। (গান্ধীজী পবতেন ছোট একখানা কাপড়—এদেশের গরিব চাষী যা পবে ; গায়ে জামা পবতেন না—গরিবেরা জামা গায়ে দিতে পায় না বলে ; তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ নেহাত গরিবের মত। তাই ইংলণ্ডের মন্ত্রী চার্চিল সাহেব বিদ্রূপ ক'রে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ভাবতেব অর্ধনগ্ন ফকির—**half-naked beggar of India**')।

কিছুদিন গেলো। বৃটিশ-মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এক আইন

উপস্থিত করলেন। গান্ধীজী দেখলেন, এ আইন পাস হ'লে ভাবতের হিন্দু ও মুসলমানদেব মধ্যে ভাগ হ'য়ে যাবে—তাদের সর্বনাশ হবে। বললেন, 'যতদিন না এই আইন তুলে দেওয়া হয়, ততদিন আমি উপোস করবো, কিছুই খাবো না। এতে যদি মবি, সেও ভাল।' সেই আইন শেষ পর্যন্ত তুলে নিতে ম্যাকডোনাল্ড বাধ্য হলেন। এবারেও সত্যাগ্রহেব বিবাট জয় হোলো।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ। গুরুভায়ুব মন্দিবে অস্পৃশ্য জাতদের বা হবিজনদেব ঢুকতে দেওয়া হোতো না। গান্ধীজী বললেন, 'ওরা ছোটজাত হ'তে পারে, কিন্তু ভগবান তো ওদেরও। ওদেব মন্দিরে ঢুকতে দিতে হবে।' এই ব'লে গান্ধীজী অনশন স্থুরু করলেন। তখন হবিজনদেব মন্দিবে ঢুকতে দেওয়া হোলো।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তব-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে গেলেন অহিংস ও সত্যের কথা শোনাতে। সীমান্তদেশ তাঁকে পেয়ে কৃতার্থ হোলো। বর্তমানে গান্ধীজীর এতবড়ো ভক্ত দেশ ভাবতবর্ষে বোধহয় আর নেই বললেও হয়।

এবাবকার মহাযুদ্ধেব স্থুরু হোলো। গান্ধীজী আগেব বার ঠকেছেন। এবার বললেন, 'এ যুদ্ধে আমরা কোনো সাহায্য করবো না।' 'একক সত্যাগ্রহ' স্থুরু হোলো। একজনের পব একজন সত্যাগ্রহী প্রচার করতে লাগলেন, 'এই যুদ্ধে এক পাই দেবো না, এক ভাই দেবো না।' মহাত্মা প্রচার করলেন

—'লড়াইমে ধন-জন দেনা হারাম হ্যায়।' সত্যাগ্রহীরা দলে দলে জেলে গেলেন। প্রথম সত্যাগ্রহী হলেন আচার্য বিনোবা ভাবে, দ্বিতীয় জন হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দেব ৮ই আগস্ট গান্ধীজী ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে বললেন, 'Quit India—ভাবত ছাড়ো!' কংগ্রেসও সেই কথা বললো। গান্ধীজীকে জেলে নিয়ে যাওয়া হোলো। দেশে আবম্ভ হোলো বিবাট আন্দোলন।

খুব বড় বকমেব অসুখ হওয়ায় গান্ধীজীকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে ছেড়ে দেওয়া হোলো। ইতিমধ্যে তাঁব প্রিয়তমা স্ত্রী কস্তুববা মাবা গেছেন। এদিকে তিনি জেলে থাকতে থাকতে হিন্দু-মুসলমানেব মধ্যে ভেদ এনে দিয়েছে মুসলিম লীগ। তিনি মুসলিম লীগেব সভাপতি জিন্নাসাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে মিটমাট কবতে গেলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হোলো।

ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে মিটমাট করবাব জন্যে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সিমলা পাহাড়ে বড়লাটেব বাড়িতে বৈঠক হোলো। ডাক পড়লো গান্ধীজীব। কিন্তু জিন্নাসাহেবেব হিন্দুবিদ্বেষ আবাব সব পণ্ড ক'বে দিলো।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ। ভাবতকে স্বাধীনতা দেবাব কথা মুখে নিয়ে বিলেত থেকে ইংবেজ-মন্ত্রীবা দিল্লীতে এসেছেন। ভাবতের স্বাধীনতাযুদ্ধেব সেনাপতি গেলেন তাঁদেব সঙ্গে কথা কইতে। মনে বড়ো আশা। কিন্তু তাঁব প্রধান কথা—'সবাব উপবে মানুষ সত্য তাহাব উপবে নাই।' তাই কোনো বড়লোকের

বাড়িতে তিনি রইলেন না। দিল্লীর ভাঙ্গী আব মেথরবা যেখানে বয়েছে, সেখানে গিয়ে রইলেন। বললেন, 'এরাই মানুষ, এবাই আমাব ভাই।'

ইংবেজ এবাব যে প্রস্তাব দিলো, গান্ধীজী মোটামুটি সেটা মেনে নিতে বললেন। বললেন, ঠিকমতো যদি কাজ ক'বে যাই, এই দিয়েই আমবা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পাবি। ভাবলেন, হয়তো এবাব তাঁর সাধনা সফল হবাব পথে।

তাবপর এলো ১৯৪৬এব আগস্ট—একটা দুঃস্বপ্নেব মতো। হিন্দু-মুসলমান অশান্তিব যে কালোমেঘ জন্ম নিয়েছিলো বায়ুকোণে, ১৯৪৬-এব আগস্টে সে মেঘ সমস্ত ভারত ছেয়ে ফেললো—মিলিত হিন্দু-মুসলমানেব গৌরব-ইতিহাসকে একেবাবে কালো ক'বে দিলো। দু'শো বছবেব পবাধীনতাব শৃঙ্খল-মোচনেব আশায় ভাবতমাতাব চোখে যখন ফুটে উঠছে একফোঁটা আনন্দেব আলো, তখন এই নাবকীয় মৃত্যুলীলাব ব্যথা ভ'বে তুললো তার হৃদয়। ব্যথিতা ভাবত দেখলো, তাব এক সন্তান আব এক সন্তানকে হত্যা কবছে, ভাইয়েব বুকে ছুবি বসাচ্ছে ভাই। হিন্দু-মুসলমানেব বক্তেব স্রোত মিলে বাজপথ বাঙিয়ে তুললো। ভবিষ্যৎ ভারতেব ইতিহাস বলতে লজ্জা পাবে, শুধু এক কলকাতায়ই হিন্দু-মুসলমান হতাহতেব সংখ্যা বিশ হাজাবের উপব হ'য়ে দাঁড়ালো।

দাঙ্গা সুরু হোলো সমস্ত বাংলাদেশে, সমস্ত ভাবত জুড়ে। বোম্বাইএ, যুক্তপ্রদেশে, বিহারে। দিল্লীব অখ্যাত ভাঙ্গী-

বস্তিতে গান্ধীজী শুনলেন, নোয়াখালি জেলায় অবস্থা চরমে উঠেছে—এক সম্প্রদায় আব-এক সম্প্রদায়েব হাতে নির্বিচারে নিহত হয়েছে হাজাবে হাজাবে; মেয়েদের ওপবে অকথ্য অত্যাচাবের বীভৎস-লীলা চলেছে; এক ধর্মের লোককে আব এক ধর্মে অন্তরিত কবা হচ্ছে জোব ক'রে।

মাবণযজ্ঞের এই বিষবাষ্পে গান্ধীজীব প্রেমিক হৃদয় হাহাকাব ক'বে উঠলো। তিনি ছুটে চ'লে এলেন নোয়াখালিতে। নিজ হাতে মুছিয়ে দিলেন অত্যাচাবিতা নারীব চোখেব জল, আহতের ক্ষতে বুলিয়ে দিলেন স্নেহেব প্রলেপ। সকলকে বললেন, 'একে অপবকে ক্ষমা করো, ভুলে যাও গত তিক্ততাব জ্বালা, আবাব আপন ক'বে নাও সবাই সবাইকে।' দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বহু জায়গা তিনি দেখলেন। তাবপর সুরু করলেন একা একা দাঙ্গা-বিধ্বস্ত সমস্ত গ্রাম ভ্রমণ করতে। জগৎ তাঁব এই অমানুষিক সাহস দেখে শিউরে উঠলো। তিনি বললেন, 'আজ আমাব অহিংসার অগ্নিপবীক্ষা। হিংসাব দাবানলকে যদি শীতল কবতে পারে, তবেই অহিংসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলো।' কেউ বললো, 'একা যাচ্ছেন, যদি গুণ্ডাবা আপনাকে হত্যা কবে?' উত্তবে তাঁর উদাব কণ্ঠেব বাণী শোনা গেলো, 'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি। আর, গুণ্ডা ব'লে কোন পৃথক জাতের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।'

পৌষ-মাঘের প্রচণ্ড শীত—রুদ্র সন্ন্যাসী, প্রেমিক সন্ন্যাসী গান্ধীজী চলেছেন মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম

ছাড়িয়ে, সাঁকো বেয়ে, খালি পায়ে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানেব হাতে হাত মিলিয়ে দিচ্ছেন। প্রাণেব ভয়, রোগের ভয়, সব উপেক্ষা ক'বে চলেছে তাঁর অহিংসার গভীব সাধনা। যার বাড়িতে যেদিন যা জুটছে তাই খান—সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। তাঁব কাছে সব মানুষ সমান। গান্ধীজী হিন্দু, গান্ধীজী মুসলমান···না, গান্ধীজী হিন্দু নন, মুসলমান নন, তিনি মানুষ—অতিমানুষ।

তারপব বিহাবের কথা। নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বিহারে জ্বললো হিংসার দাবানল। সেখানকার মুসলমানদের উপর হোলো অত্যাচার। নোয়াখালিতে গান্ধীজীর কাজ তখনও শেষ হয় নি। তিনি সেখান থেকে ব'লে পাঠালেন, বিহারবাসীরা দাঙ্গা যদি না থামায়, তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ কববেন। এ কথায়, মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো বিহারের দাঙ্গা থেমে গেলো। নোয়াখালি পরিভ্রমণেব পরে গান্ধীজী গেলেন বিহারে। নীলকণ্ঠের সহিষ্ণুতা নিয়ে হিংসার সমস্ত বিষ তিনি নিঃশেষ করলেন, আহতের সর্ব অঙ্গে বুলিয়ে দিলেন শান্তিস্নিগ্ধ দক্ষিণপাণি।

মহাত্মা বললেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্ণ সম্প্রীতি ফিরে না আসা পর্যন্ত বাকি জীবন নোয়াখালিতে কাটাবো।' এদিকে পাঞ্জাবেও সুরু হয়েছিলো ভয়াবহ দাঙ্গা। তাই তাঁকে যেতে হোলো পাঞ্জাবে। সেখানকার কাজ সেরে নোয়াখালি যাবার পথে বিশ্রাম নিতে এলেন সোদপুর আশ্রমে।

ভাবতবর্ষে এর মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী ইংবেজকে বলেছিলেন—'ভাবত ছাড়ো'; সে কথা সফল হোলো—১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলো। যে স্বাধীনতাব জন্যে তিল তিল ক'বে আত্মত্যাগ কবতে হয়েছে দীর্ঘ ষাট বছব ধ'বে, যাব জন্যে ডালি দিতে হয়েছে সহস্র সহস্র ভাবতসন্তানের অমূল্য শিব—অবশেষে সেই স্বাধীনতা এলো কিন্তু গান্ধীজীব মনেব মেঘ তো ঘুচলো না। কারণ স্বাধীনতা এলো গোটা ভাবতবর্ষেব জন্যে নয়। ভারতবর্ষ দু'ভাগে ভাগ হ'য়ে গেলো—ভাবতীয় ইউনিয়ন আব পাকিস্থানে। ভাবত বিভক্ত হোলো—সেই সঙ্গে বিভক্ত হোলো গান্ধীজীর হৃদয়। সত্যদ্রষ্টা ঋষি ধ্যানে বসলেন, কিছুকাল বইলেন নীবব। তারপব একদিন তাঁব মুখে ধীব জলদকণ্ঠে দৈববাণী শুনলো ভাবতবাসী—'ভাবতবাসী বিভক্ত হ'য়ে পৃথক হ'য়ে থাকতে পাবে না, অদূবভবিষ্যতে আবাব ভাবত এক হ'য়ে যাবে।' এই দৈববাণী কবে সফল হবে, তাব জন্যে ভাবতবাসী রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা কবছে। সদ্য-পাওয়া স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'সবে মাত্র স্বাধীনতাব মন্দিবেব দরজায় আমবা পা দিয়েছি, স্ববাজ এখনও বহু দূবে। যে স্ববাজেব মধ্যে হিংসা-দ্বেষ থাকবে না, থাকবে না অত্যাচার আব শোষণ, থাকবে না অসাম্য আব অস্পৃশ্যতা, থাকবে না ভয় আব দাবিদ্র্য, তার জন্যে প্রচুব পবিশ্রম আর আত্মত্যাগ আমাদের এখন করতে হবে।

কিন্তু ভারতের দুঃখের দিন শেষ হবার সময় হয় নি এখনও। ১৯৪৭এর সেপ্টেম্বরে আবার দাঙ্গা সুরু হোলো। গান্ধীজী তখন কলকাতার সবচেয়ে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চল বেলেঘাটায় শান্তি-স্থাপনে ব্যস্ত। কিছুতেই যখন দাঙ্গা থামলো না, গান্ধীজী তখন অনশন আরম্ভ করলেন। দাঙ্গা না থামলে উপোসে প্রাণ দেবেন, এই হোলো তাঁর পণ। কলকাতার অধিবাসী আর ছাত্ররা প্রাণপণ চেষ্টা করলো দাঙ্গা থামিয়ে এই মহামানবের প্রাণ বাঁচাতে। কয়েকটি মূল্যবান প্রাণ গেলো এই শান্তি-প্রচেষ্টায় দাঙ্গাকারীদের হাতে। অবশেষে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোলো। ৭৩ ঘণ্টার পর গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। দু'একদিন পরে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটলো। হিন্দু আর মুসলমান দাঙ্গাকারীরা বহু প্রকারের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে গেলো গান্ধীজীর পায়ের কাছে। তারা মহাত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করলো, 'ভাইএ ভাইএ লড়বো না, দাঙ্গা ক'রে মরবো না।' জগৎ স্তম্ভিত হ'য়ে দেখলো, হিংসার উদ্ধত ফণা কি ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অহিংসার দুর্জ্জয় প্রভাবের কাছে।

শান্তিদূতের কাজের শেষ নেই। আবার দাঙ্গা লাগলো পাঞ্জাবে। অশীতিবর্ষ গান্ধীজীকে যেতে হোলো সেই নিয়ে। কবে অহিংসার কাছে হিংসার পূর্ণ আত্মসমর্পণ হবে, কে জানে? ভারতবর্ষকে শান্তিময় করবার যে ব্রত তিনি নিয়েছেন, কবে সে ব্রত উদ্‌যাপিত হবে, কে বলবে?

শান্তিদূতের কাজের শেষ নেই। আবার দাঙ্গা লাগলো পাঞ্জাবে। অশীতিবর্ষ গান্ধীজীকে যেতে হোলো সেই নিয়ে। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে নেভাতে চেষ্টা করলেন হিংসার আগুন —থেমে গেলো পাঞ্জাবের দাঙ্গা। এব পব গান্ধীজী গেলেন দিল্লীতে। পূর্ববঙ্গে আর পাঞ্জাবে দাঙ্গার ফলে যে হাজার হাজার লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চ'লে এসেছিল ভারতীয় ইউনিয়নে, তাদের সহায়তার আর সান্ত্বনাব জন্যে। এদের সাহায্যের জন্য ভারত-সরকাব যথাসাধ্য চেষ্টা কবছিলেন না, এর প্রতিবাদে তিনি অনশন সুরু কবলেন। কয়েকদিন অনশন করবার পর সবকার তাঁকে বাস্তুহারাদেব পুনর্বসতি এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে, তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন অবশেষে। এরই কয়েকদিন আগে দিল্লীতে তাঁর এক প্রার্থনা সভায় কোন্ এক দুর্বৃত্ত তাঁব প্রতি এক বোমা নিক্ষেপ কবে। তারপবেও তিনি সম্পূর্ণ নির্ভয়, তারপরেও তিনি প্রার্থনা-সভায় যোগ দিতে লাগলেন।

তারপব ভাবতের বুকে নেমে এলো অভিশপ্ত দিন—১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি। বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ধীরে ধীরে চলেছেন প্রার্থনা-সভার দিকে; অনশন-ক্লেশে শবীর একটু দুর্বল; মনে মনে আকাঙ্ক্ষা—শরীব একটু সুস্থ হ'লে ১৩ই ফেব্রুয়ারি নোয়াখালি যাবেন—হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীব ব্রত নিয়ে বাকী জীবন কাটাবেন সেখানে। পাশের জনতার ভিড় থেকে এগিয়ে এলো হিংস্র এক দস্যু—নাথুরাম ,গড্‌সে—পর পর তিনবার গুলি কবলো নিরস্ত্র সেই সন্ন্যাসীর উন্মুক্ত বুকে!

ভারত-মাতার হৃদয়-তন্ত্রী ব্যথায় খান-খান হ'য়ে পড়লো—সূর্যের আলো গেল ম্লান হ'য়ে!—'হা রাম' ব'লে বাহু দুখানি প্রসারিত ক'রে দিলেন আততায়ীব দিকে, ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো জ্ঞানহীন দেহ। তারপব কেবলমাত্র সাতাশটি মিনিট—৫-৫৭ মিনিটে হোলো মহানির্বাণ—মুক্ত আত্মা ছড়িয়ে পড়লো ভারতের আর জগতেব শত কোটি মানবেব বুকে!···নাথুরাম··· নাথুবামই কি যুগে যুগে হত্যা ক'বে এসেছে ইতালীর মহা-মানব সক্রেটিসকে, তববারি বসিয়েছে অহিংসাব অবতাব বুদ্ধেব বুকে, ক্রুশবিদ্ধ কবেছে যীশুখৃষ্টকে?

ছোটবেলা রাজা হবিশ্চন্দ্রেব গল্পে সব ত্যাগ করার কথা তিনি পড়েছিলেন। টলস্টয়ের বইতে পড়েছিলেন, গরিব চাষীর জীবনই হচ্ছে সত্যিকার মানুষের জীবন। তাই সেই আদর্শে সব ছেড়ে দিয়ে তিনি সম্বল করেছিলেন একখানা খদ্দরের আটহাতি ধুতি, একখানা খদ্দবেব চাদর, একজোড়া চটি জুতো আর একটা লাঠি। সমস্ত লোভ ছেড়ে দিয়ে যে মহাত্মা ঋষি ভারতের দবিদ্র আব অস্পৃশ্য, মেথর আর ছোট-লোকদেব দুঃখ দূর করার জন্যে নিজে অনন্ত দুঃখ ববণ ক'বে নিলেন হাসিমুখে, ভগবান তাঁর চেষ্টা সফল করুন। সমস্ত মানুষজাতিকে বাঁচিয়ে রাখাব মন্ত্র যিনি ছড়িয়ে দিলেন গোটা দুনিয়ায়, ভগবান তাঁব স্বপ্ন সার্থক ক'রে তুলুন।

গান্ধীজীর কয়েকটি বাণী

(১) আমি সবচেয়ে গবিব মেথরের পায়েব ধূলো নিতে পাবি. কিন্তু সম্রাটেব কাছে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়াতে রাজী নই।

(২) হিংসায় হিংসা শেষ হয় না—অহিংসাই হিংসার শেষ করতে পাবে।

(৩) যে রাজনীতিতে ঈশ্ববের স্থান নেই, সে বাজনীতি আমি মানি না।

(৪) সত্যই ধর্ম—সত্যই ঈশ্বব।

(৫) যে লোক স্বেচ্ছায় নিজের দোষের কথা পবিষ্কাব ক'বে অন্যেব কাছে বলে এবং আর না কবাব প্রতিজ্ঞা কবে, সে সবচেয়ে পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত করে।

(৬) আমাব জীবনে গোপনতা ব'লে কিছু নেই। আমার জীবনেব প্রতিটি পাতা সকলেব জন্যে খোলা।

(৭) সত্যেব পথে চলেছি ব'লে আমাব ভয়ংকব ভুলও আমাব কাছে ক্ষুদ্র ব'লে মনে হয়।

(৮) কেবল সত্যই আছে, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো বস্তু পৃথিবীতে নেই—এ বিশ্বাস দিনে দিনে আমার বেড়ে যাচ্ছে।

(৯) 'মহাত্মা' আখ্যাব জন্যে আমার কোনোদিন অহংকার হয়েছে ব'লে মনে পড়ে না।

(১০) আমার মতো শত শত লোক নষ্ট হ'য়ে যাক, তবু সত্যের জয় হোক।

(১১) নাস্তিক যখন বেঁচে যায়, তখন সে বলে—ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেলাম। আস্তিক সে অবস্থায় বলে—ঈশ্বর বাঁচালেন।

(১২) মনের ময়লা দূর করার জন্যে উপাসনা হচ্ছে ঔষধ।

(১৩) আধো-জানা শিক্ষক দিয়ে বইপড়া জ্ঞানের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু নিজেকে যে চিনতে চায়, তার কাজ সে-শিক্ষক দিয়ে চলে না।

(১৪) সত্য বজ্রের চেয়েও কঠিন, কমলের চেয়েও কোমল।

(১৫) বিপক্ষের প্রতি ন্যায় করলেই, নিজের পক্ষে ন্যায় সহজে পাওয়া যায়।

(১৬) গুরুর জন্যে অনুসন্ধানের ভেতরেই সফলতা রয়েছে, কেননা, শিষ্যের যোগ্যতা অনুযায়ীই গুরু মেলে।

(১৭) যে প্রতিষ্ঠানকে সাধারণে সাহায্য করতে রাজী নয়, তাকে সাধারণের প্রতিষ্ঠান ব'লে চালাবার অধিকার কারও নেই।

(১৮) স্বাধীনতার জন্যে নিরক্ষর থেকে প্রকাশ্য রাস্তায় পাথর ভাঙাও পরাধীন থেকে লেখাপড়া শেখার চেয়ে ভালো।

(১৯) সত্য এক বিশাল বৃক্ষ, তার সেবা করলে তার

থেকে অনেক ফল লাভ হয়। সত্যের শেষ নেই। যতই তাব ভিতব গভীবভাবে প্রবেশ করা যায়, ততই তা থেকে বস্তু পাওয়া যায়, সেবার ক্ষেত্র আবো ছড়িয়ে পড়ে।

(২০) জনসেবকেব কোনো দামী উপহাব নিতে নেই।

(২১) বীমা কবায় কতকটা ভীরুতা ও ঈশ্ববের প্রতি অবিশ্বাস আছে।

(২২) প্রত্যেক জিনিসই নানা দিক থেকে দেখা যেতে পাবে, এবং সেই সেই দৃষ্টিতে সে জিনিস সত্য হলেও সে-সবেব প্রত্যেকটি একই সময়ে একই অবস্থায় সত্য নয়।

(২৩) মানুষ ও তাহাব কাজ এ দুটো ভিন্ন জিনিস। ভাল কাজেব প্রতি অনুরাগ এবং খারাপ কাজেব প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ হওয়া উচিত।

(২৪) যদি অহিংসাব ব্যবহাব না হয়, তবে সত্য লাভ হয় না। সত্যের অনুসন্ধানের মূলে অহিংসা আছে।

(২৫) মানুষেব মধ্যে বয়েছে অনন্ত শক্তি। মানুষেব অনাদরে বা তিরস্কাবে সেই শক্তিবই অনাদর কবা হয় এবং তাতে যেমন সেই মানুষটির ক্ষতি হয়, তেমনি তাব সাথে সাবা জগতেরও ক্ষতি হয়।

(২৬) আমি আত্মীয় এবং অনাত্মীয়, দেশী ও বিদেশী, সাদা ও কালো, হিন্দু আর মুসলমান অথবা খৃষ্টান, পারসী কি ইহুদীর মধ্যে ভেদ রাখি নি।

(২৭) কোনও বিষয়ে পুরো অনুসন্ধান না ক'বে সে বিষয়ে

অপরের বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়াতে সত্যের উপর আঘাত করা হয়।

(২৮) মানুষের মনুষ্যত্ব হচ্ছে স্বেচ্ছায় সংযমের বশীভূত হওয়া।

(২৯) চিন্তাকে সংযত করার চাবি মানুষের কাছেই আছে। এই চাবি প্রত্যেককেই নিজেব জন্য খুঁজে নিতে হয়।

(৩০) ময়লা মন উপবাস দ্বাবা শুদ্ধ হয় না। মনের ময়লা বিচাব দ্বারা, ঈশ্বরচিন্তা দ্বাবা, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ দ্বারাই দূর হয়।

(৩১) শরীরেব সাথে মনও যেখানে উপবাস করে না, সেখানে উপবাসের ফল হয় অহংকার।

(৩২) সত্যেব অনুসবণ কবাব চেষ্টায় বাগ, স্বার্থপবতা বিদ্বেষ ইত্যাদি সহজেই শান্ত হয়। যদি শান্ত না হয়, তবে সত্যলাভ হয় না।

(৩৩) বাগ এবং বিদ্বেষপূর্ণ লোক সবল হ'তে পারে, কথায় সত্যপালন করতে পাবে, কিন্তু শুদ্ধ সত্য লাভ কবতে পারে না।

(৩৪) বিশুদ্ধ সত্যের জ্ঞান যাব হয়, সে বাগ বিদ্বেষ ইত্যাদি থেকে মুক্ত।

(৩৫) যখন আমরা নিজেকে শাসন কবতে শিখবো, তখন স্বরাজ আসবে। প্রত্যেকে যখন নিজের নিজের স্বাধীনতা নিজেই প্রতিষ্ঠা করবে, তখন স্বরাজ আসবে।

(৩৬) হিংস্র যুদ্ধের সৈনিককে যেমন কুচকাওয়াজ শিখতে হয়, অহিংস সৈনিককে তেমনি গড়ার কাজ করতে হবে।

(৩৭) ব্যক্তি গ্রামেব জন্য, গ্রাম জেলার জন্য, জেলা প্রদেশের জন্য আর প্রদেশ দেশের জন্য মরবে, এইটেই দেশ-প্রেমেব শিক্ষা।

(৩৮) আমি সকলের জন্যে সমান বণ্টন চাই। কিন্তু এটা সম্ভব হবে না ব'লে মনে হয়, তাই আমি উপযুক্ত বণ্টনেব পক্ষপাতী।

(৩৯) আমি সাধাবণ সরল যন্ত্র ব্যবহাবের পক্ষপাতী। এতে লোকেব পরিশ্রম কম হবে, লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী গুরুতর পরিশ্রম থেকে মুক্তি পাবে।

(৪০) স্বদেশী হোক, বিদেশী হোক, যে কোন শাসন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টার মধ্যেই আসল স্বাধীনতাব সত্যিকাব মানে।